বাঘমামার গল্প

সুকুমার দে সরকার

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৬
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২
ছেপেছেন
স্বস্তিক মুদ্রণালয়
২৭।১বি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
ছবি এঁকেছেন
শৈল চক্রবর্তী
১.২৫

জীবজন্তুর গল্প যারা
ভালবাসে তাদের হাতে—

অসিদন্ত বাঘ

ওবি নদীর জলতরঙ্গে মুঠো-মুঠো তারা ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি। দূর থেকে ভেসে আসে উত্তর মহাসাগরের অশান্ত উত্তাল গর্জন। আর ওবি নদী ধেয়ে চলে নেচে গেয়ে, বুকে ঢেউ তুলে, পার হয়ে সুমেরুবৃত্ত, পার হয়ে পারের বিশাল দিগন্তময় পত্রমোচী বন। বনময় মহীরুহদের সে কী উদাত্ত গম্ভীর কানাকানি! উত্তর এশিয়ার আদিম আকাশে সুদীর্ঘ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গাছের দল, চাঁদ ধরো-ধরো। চাঁদ নয় তো—পাখা-মেলা উড়ন্ত পাহাড়ের দলের হাতছানি-দেওয়া, হলদে রহস্য।

সুদীর্ঘ পত্রমোচী বন থেকে ভেসে আসে পাতা ঝরার মৃদু রহস্যময় আওয়াজ। শীতোষ্ণ বাতাস বিরাটকায় লাল সবুজ পাতার দলে লুকোচুরি খেলে যায়। হলদে চাঁদের সোনালি আভায় জ্বলে-ওঠা নীল আকাশের চাঁদোয়ার নিচে গাছের দল যেন মল পরে ঝুমুর নেচে ওঠে।

হিমযুগ শেষ হয়ে গেছে। চলে গেল কোটি-কোটি বছর। সুমেরু-বৃত্ত হিম-সমাধি থেকে আবার পাতায় ফুলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আদিম পৃথিবীর আদিম সরীসৃপ জাতিরা নিঃশেষ হয়ে গেল। আজকের এই উষ্ণযুগ ছাড়িয়ে, ছাড়িয়ে আরও কয়েকটা হিমযুগ—এই পত্রমোচী বন একদিন কেঁপে উঠেছিল মাংসাশী ডাইনো-সরদের পদভারে। ডাইনোসররা শিকার করে বেড়াত নিরামিষাশী জাইগান্টোসোরাসদের অথবা আজকের সমুদ্রের নীল তিমিদের চেয়েও আকারে বড় ডিপ্লোডোকাস কার্নেগিদের আর টিরানোসোরাসদের। জাইগান্টোসোরাস আর টিরানোসোরাসরা শিকার করত পৃথিবীর আর-এক রকমের আদিম প্রাণ অচল দীর্ঘদেহী গাছ পাতা ফল মূল।

এই আদিম পৃথিবীর আর বনভূমির সবই গড়া প্রকাণ্ড ছাঁচে। সূর্য-বংশী পৃথিবীর বুকের আগুন তখনও নেবে নি। পাহাড়েরা পাখা মেলে উড়ে বেড়াত। মানে, আজ সমতল—কাল দেখা গেল কোথা থেকে সেখানে এক পাহাড় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!

আর আদিম এই আমাদের কুমারী পৃথিবী বন্য উর্বর। আকাশ-ছোঁয়া গাছের দল, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দিগন্ত-ছড়ানো পর্বত-প্রমাণ ঘাসের ক্ষেত আর সবুজ শ্যামল হলদে লাল কত লতা-গুল্ম। এরই মাঝে চরে বেড়াত বিরাট বিশালকায় জাইগাণ্টোসোরাস, টিরানো-সোরাস, ডিপ্লোডোকাসের দল। আবার ওদেরই মাংসের ওপর নির্ভর করে আশেপাশে চরত তেমনি বিশাল আকার ডাইনোসরের দল। আর পাশেই সমুদ্রের সে কী খরস্রোত! ক্ষণে-ক্ষণে বাষ্প হয়ে নীলাভ হলদে আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে, আবার জমাট কালো মেঘ হয়ে ঘূর্ণি বাতাসের তাণ্ডব নৃত্য করে, জল হয়ে বনভূমি প্লাবিত করে দিয়ে গেছে। সেই খরস্রোতা সমুদ্রে গলা অবধি ডুবিয়ে বসে থাকত আর-এক রকম সরীসৃপ,—মেসোসর, প্লেসিওসর আর ইখ্‌থিওসরের দল। আর আকাশে গাছের ডাল থেকে ডালে উড়ে বেড়াত বিরাট এক পাখি সরীসৃপ—টেরোড্যাকটিলরা।

বনভূমির সেদিনের সে উষ্ণ নিশ্বাস কে শুনেছে? মানুষ তখন কোথায়? তখনও কোটি-কোটি বছর বাকি মানুষের এই পৃথিবীতে উদ্ভূত হতে।

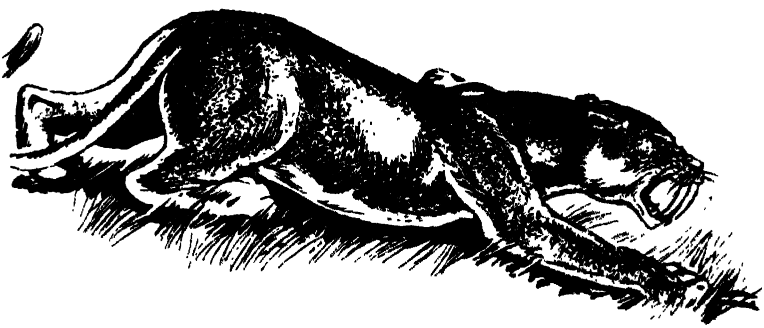
* * *

আবার এসেছে একটা হিমযুগ। দুরন্ত ঝড় আর বরফ আর বরফের পাহাড়। সমুদ্র বরফ হয়ে জমে গেছে। বনভূমি নিশ্চিহ্ন। খাদ্যের অভাবে জাইগাণ্টোসোরাসরা টিরানোসোরাসরা নিশ্চিহ্ন, আর তাদের অভাবে মিলিয়ে গেছে নিঃসীম শূন্যতায় ডাইনোসর টেরো-ড্যাকটিলের দল। পৃথিবীর স্থলভাগে সরীসৃপের যুগ নিঃশেষ। কিন্তু প্রাণও কি শেষ হয়ে গেছে, না জন্ম নেবে আবার নূতন রূপে?

আবির্ভাব হবে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী জন্তুদের ? আবার কোটি কোটি বছর। হিমযুগ, উষ্ণযুগ, হিমযুগ, আবার উষ্ণযুগ। চাকা ঘুরে চলেছে। ওবি নদীতে ঢল নেমেছে, উত্তরমেরু সমুদ্রে ঢেউ আথাল পাথাল। হিমসমাধি ভেঙে আবার জেগে উঠেছে মেরুবৃত্তের বনভূমি। সূর্যের তাপে বাষ্পে জলে আবার অঙ্কুরিত হয়েছে বিরাট মহীরুহের দল। সবুজ ঘাসের ক্ষেত বাতাসে ঢেউ তুলে ছড়িয়ে গেছে দিগন্তে। আর এই বনভূমিতে এসে গেছে এল্ক, রেনডিয়ার হরিণের দল, লোম-ঝামরানো বাইসনেরা। আকাশে পাখিরাও দেখা দিল পৃথিবীতে প্রথম।

* * *

দমকা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এখনও গাছের পাতা বেয়ে জল ঝরছে টুপটুপ। আর সেই জলের ফোঁটার ওপর পড়ন্ত সূর্যরশ্মি পড়ে মনে হচ্ছে যেন গলা সোনা ঢেলে দিয়েছে বনভূমির সবুজ পাতায় পাতায়। হঠাৎ মনে হল, সমস্ত বনটা যেন চলতে শুরু করেছে। গাছপালার ডাল ভাঙছে মট্-মট্। জলাভূমির ওপর থেকে পাখির দল উড়ে গেল। কার যেন পদভারে মেদিনী কম্পমান। ওবি নদীর জল থেকে জলহস্তীর দল মুখ খুলে তাকাল। কারা ?



ম্যামথ হাতির দল গাছ ভাঙতে-ভাঙতে আর খেতে-খেতে সন্ধ্যায় আসছে জলের খোঁজে। এক-একটা হাতির আকার বিশাল। সমস্ত শরীরে ঝামরানো লোম আর কয়েকটা হাতির চারটে করে গজদন্ত। জলার পাড়ে দিগন্ত-ছড়ানো সুদীর্ঘ ঘাসজমিতে বাইসনের দল লাল

চোখে ম্যামথ দলের আসা লক্ষ্য করে একটা অদ্ভুত শব্দ করে উঠল। আর সেই সঙ্কেতে চলতে শুরু করল বাইসনের দল। প্রথমে কয়েকটা জোয়ান বাইসন সার বেঁধে। তাদের পিছনে সমস্ত দল। মায়েদের পাশে-পাশে বাচ্চার দল।

ওদিকে হলদে-সবুজ ঘাসের ভেতরে ভেতরে আর একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার গুঁড়ি মেরে-মেরে বাইসনের দলটাকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছিল। ম্যামথ হাতিদের ক্ষ্যাপা খেয়াল-খোলা এগিয়ে আসায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল তার। অকস্মাৎ সেই বনভূমি তীব্র গম্ভীর গর্জনে কেঁপে-কেঁপে উঠল। হাতিরা থমকে দাঁড়াল। এল্ক, রেনডিয়ার ত্রিসীমানায় নেই। আর বাইসনরা ছুটল দিকবিদিক হারিয়ে অথচ দল ঠিক রেখে। তাদের দৌড়ে বনভূমিতে যেন ভূমিকম্প হতে লাগল।



'বাঘ! বাঘ! অসিদন্ত বাঘ!'

দীর্ঘ প্রকাণ্ড দেহ, হলদে পাঁশুটে রং আর ওপরের ঠোঁটের থেকে

নিচের ঠোঁটের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে দুটো তলোয়ারের মত লম্বা দাঁত।

বাঘটা বাইসনের দলকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। অত বড় প্রকাণ্ড শরীর, তবু তীব্র মসৃণ তার গতি, শরীরের সবল পেশীগুলোতে তার ঢেউ খেলে যেতে লাগল। বাইসনের দল এ বাঘকে চেনে। আত্মরক্ষার জন্য তারা সোজা ছুটতে-ছুটতে কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিতে হঠাৎ দলশুদ্ধ ডাইনে ঘুরে যায়, আবার বাঁয়ে। এরকম করে অসিদন্ত বাঘমশাইকে তারা কয়েকবার ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু বাঘও শিখে গেছে ওদের কায়দা। সে শুধু বাইসনের দলের পেছনে তাড়িয়ে যেতে লাগল। বাইসনদের ক্লান্ত করে আনতে হবে। কাঁধে জোর থাকতে সবল জোয়ান বাইসনদের গোটা দলকে ঘাঁটাতে অসিদন্ত বাঘও সম্পূর্ণ সাহস পায় না। আর এভাবে মাইলের পর মাইল উড়ে যেতে-যেতে হঠাৎ আর-একটা বন-কাঁপানো হুঙ্কার। বাঘটা লাফিয়ে পড়েছে একটা বাইসনের হাতির মত কাঁধে। একটা মুহূর্ত! তারপরে বাঘের অসি-দাঁত দুটো বসে গিয়ে বাইসনটার হৃৎপিণ্ডের প্রধান শিরা ছিঁড়ে দিয়েছে।

এর পরে একটা অদ্ভুত দৃশ্য। বাঘ শিকার টেনে নিয়ে ভোজে বসে গেছে, আর কিছু দূরেই চরছে বাইসনের দল। তারা জানে আজ আর বাঘ তাদের শত্রু নয়। খাবার প্রয়োজনেই শিকার করে মাংসাশী জানোয়ার। মারবার জন্যে নয়।

ওবি নদীর দুরন্ত জলে দিগ্বলয়-ছোঁয়া সোনালি সূর্য তরল গলানো সোনা ঢেলে দিয়েছে। দূরের তুষার-মুকুট-পরা পাহাড় যেন একটু মাথা হেলিয়ে কাকে ধ্যান-মৌন আবাহন জানাচ্ছে। সূর্য আকাশে থাকতে-থাকতেই শ্বেত পাংশু চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে। ম্যামথ হাতিদের গম্ভীর বৃংহিত আর দূর থেকে ভেসে-আসা সমুদ্র গর্জন যেন সন্ধ্যার বন্দনা গাইছে।

বাঘমামার গল্প

আকাশ-ছোঁয়া হিমালয় থেকে মল-পরা ছোট্ট দুরন্ত মেয়েটির মত লাফিয়ে নেমে কত পাহাড়, বন, জনপদ, দীর্ঘ পথ পার হতে-হতে নদী যেন বয়সে বড় হয়ে ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ে। তার পরে পথের শেষে সমুদ্দুরের স্বাদ পেয়ে যেন হাসিতে খুশিতে শাখায়-প্রশাখায় শান্ত হয়ে বয়ে চলে।

নদীর কিনারে কিনারে তাল শিরিষ সুপুরি আর বটগাছ নদীর জলে ছায়া দেখে, তারপর যতদূর চোখ যায় সুন্দরি গাছের বন। সেই বনকে একটুখানি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মানুষের বসতি, আর বাকি নদীময় বনরাজ্য সকলের। দেখা যায় না কিন্তু দূরে দিকচক্রবালে আভাস পাওয়া যায়, কালাপানি আথাল-পাথাল।

কাচের মত পরিষ্কার নীল আকাশে ঘুরে ঘুরে চিল উড়তে উড়তে ছোট্ট হয়ে যায়। তীরের মত ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায় কয়েকটা চড়াই পাখি মানুষের বসতির পানে। হনুমানেরা কোথায় যেন বনের ভেতর হুপহাপ লাফালাফি লাগিয়েছে। বন–কুকুরের ঘেরাও-করা ডাক বাতাসে কাঁপতে-কাঁপতে ভেসে আসে। শোনা যায় হরিণের দৌড়ের শব্দ। নদীর বালুচড়ায় নড়বড়ে কুমিরগুলো ধ্যান-চোখে হাঁ করে অনড়, কয়েকটা ছোট পাখি নির্ভয়ে কুমিরের হাঁ-করা মুখের ভেতর ঢুকে মুলোর মত দাঁতগুলো খুঁটে-খুঁটে পরিষ্কার করে দেয়।

চাঁদ ওঠে। ভরা চাঁদ যেন পুরো শূন্য; তারপরে তরমুজের ফালির মত চন্দ্রবিন্দু হতে-হতে হসন্তর মত হাসতে-হাসতে থেমে যায়। বালিয়াড়ি ঝিকিমিকি। কুমিরেরা নড়বড় করে জলে নামে পণ্ডিতরা থেকে-থেকে প্রহর জানিয়ে দেয়, আর কখনও বা মামার গম্ভীর হুঙ্কারে বন গম-গম করে ওঠে।

সুয্যিঠাকুর পশ্চিমের পানে যতই ঢলে যান, আকাশে ততই লাগে রঙের মেলা।

প্রহর ডাকতে উঠে বুড়ো শেয়াল-পণ্ডিত আকাশের পানে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। লাল আকাশে কালো-কালো শকুনের ঝাঁক উড়ছে ঘুরে ঘুরে।

বুড়ো পণ্ডিত আকাশে মুখ তুলে জানিয়ে দিল—'হুয়া হুয়া হুয়া!'

আরও সব পণ্ডিতদের সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল, 'ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া?'

'মামা ভোজে বসেছে,' বলল বুড়ো পণ্ডিত।

'কোথায়? কোথায়?'

'ঐ যে যেখানে শকুনেরা দেখা যায়।'

শেয়াল পণ্ডিতেরা হৈ-হৈ, হুই-হুই, হুয়া-হুয়া করে উঠল, 'চল ভাই, চল ভাই, মামার পেসাদ পাওয়া যাবে!'

'শকুনে ঠুকরে দেবে,' বলল একজন।

কয়েক জন ছোকরা-পণ্ডিত বলে উঠল, 'ইস্! আমরা খামচে দেব!'

বুড়ো পণ্ডিত বলল, 'শকুন-টকুন কিছু নয়, মামার থাবড়াটা বাঁচিয়ে কিন্তু।'

সন্ধ্যার ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে দেখা গেল, শেয়াল-পণ্ডিতদের চোখ জ্বলছে নীল নীলার মত।

গোদা হনুমানদের সঙ্গে হরিণের দলের মিতালি। হরিণেরা দল মিলে সাবধানে সারা বনে ঘুরে বেড়ায়। বনে হরিণদের শত্তুরের অভাব নেই, তাই কানটা খাড়া রাখতে হয়। আর কানে আসে চড়াইদের চিকিমিকি কথা। ধনেশ পাখির ঠোঁটটা বেজায় লম্বা, তাই কথাগুলোও ধারালো। কিন্তু কোথায় কোন্ গাছে ফল ধরেছে, ফল পাকল কোথায়, আম জাম না যজ্ঞিডুমুর, কান খাড়া করে হরিণেরা

জেনে নেয়। গাছে ফল পাকলে হরিণদের কী? তারা তো গাছে চড়তে পারে না! তাই হরিণেরা পাকা ফলের খবর জানিয়ে দেয় গোদা হনুমানদের। গোদারা লাফিয়ে চলে ডালে-ডালে, হরিণেরা ধেয়ে চলে তুলকি চালে। ফলন্ত গাছের মাথায় হুপ-হাপ। পাখিরা উড়ে পালায়। গোছা-গোছা ফল খায় গোদা হনুমানেরা আর আহ্লাদে নৃত্য করে। গাছে নাড়া পেয়ে পাকা ফল ঝরে পড়ে। হরিণেরা নিবিষ্ট মনে কাজে লেগে যায়।

বড় হরিণটা একবার মুখ তুলে বলল, 'ও ভাই গোদারা, একটু নজর রেখো।'

গোদারা বলে, 'কোন ভয় নেই। এই গাছের মাথা থেকে সারা পৃথিবী দেখা যায়। ঐ দেখ না নদীর পারে এক পা তুলে বসে আছে ধার্মিক বক। কুমিরেরা রোদ পোয়াচ্ছে। ঐ দূরে পলাশ গাছ রাঙা হয়ে আছে।'

হরিণ বলল, 'অত দূরে নয়, বনের ভেতর দেখ। ঘাস নড়ছে কি?'

গোদারা বলল, 'ঘাস নড়লে কী হবে? গোখরো সাপ?'

শেঙাল হরিণ বলল, 'না না, মামার ভয়। মামা কিন্তু বেজায় ধূর্ত! অত বড় ডোরা-কাটা শরীর হলে কী হবে, খিদে পেলে ঘাসের ভেতর গুঁড়ি মেরে এমন গা-ঢাকা দিয়ে এগোবে যে একটু সিস-সিস করে ঘাসের ডগার মাথা নড়া ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না।'

একটা গোদা হনুমান বলে উঠল, 'তাই তো, ঘাস নড়ছে!'

হরিণেরা চমকে উঠল। আর হুপ-হুপ করে হেসে গড়িয়ে গেল গোদার দল, 'আরে, ঘাসের ভেতর দুটো শেয়াল-পণ্ডিত!'

হরিণেরা শিং নেড়ে নেড়ে বলল, 'ছোঃ! জানো গোদাভাইরা, এবারে দু-পেয়ে মানুষদের ক্ষেতে বড়-বড় তরমুজ ফলেছে!'

গোদারা লাফিয়ে উঠল, 'আঃ! কোথায় খবর পেলে?'

'টিয়াপাখিরা পাকা ধান খেতে যাচ্ছিল, সবুজ ঢেউ খেলিয়ে তারা বলে গেল।'

'চল ভাই চল,' গোদারা বলল।

'দিনের বেলায়!' শেঙাল হরিণ অবাক হয়ে শুধোল, 'দু-পেয়েদের তীর আছে, গাদা-বন্দুক আছে। বেজায় ভয়।'

'আরে দূর! ঠিক দুপুরবেলায় দু-পেয়েদের আলিস্যি আসে। সেই সময় চিলের মত লাফ মেরে ছিঁড়ে আনলে ধরছে কে? তারপর হাওয়ায় হাওয়ায় ডিগবাজি মেরে, ডালে-ডালে মোচড় খেয়ে উড়ে যাওয়া। তীর বেঁকে যাবে, গাদা বন্দুক পেছনে ফাটবে ধুম ধড়াস! গোদাদের তখন ধরে কে? দিন ছাড়া উপায় কী? গোদাদের তো আর পণ্ডিতদের মত রাতে চোখ জ্বলে না!'

হরিণেরা সন্তুষ্ট মনে ঝরা ফল খেতে থাকে।



এমন সময় মগডাল থেকে একটা গোদা হনুমান ডেকে উঠল, 'মামা, মামা! মামা আসছে!'

সঙ্গে-সঙ্গে থমথমে হয়ে গেল বন। গোদারা নিশ্চুপ, একটা ঝিঁঝিও ডাকছে না। আর সেই মুখর নিঃশব্দতা ভেঙে হরিণদের ছুড়-ছুড় দৌড়ের আওয়াজ ভেসে এল, তারপর মামার নিষ্ফল আক্রোশের গর্জনে বন গম-গম করে উঠল।

গোদারা বনের দুষ্টু ছেলে। দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচে দিল মামাকে।

রাত গভীর। চন্দ্রবিন্দু চাঁদ হেলে পড়েছে নদীর কোলে। তরমুজ-ক্ষেতে দুই পণ্ডিত নিঃশব্দে তরমুজ শিকারে মজে আছে—এমন সময় বুড়ো পণ্ডিত বলে উঠল, 'চুপ, চুপ! বাতাসে মামার গন্ধ ভেসেআসে!'

আর পণ্ডিতেরা দেখল, কালো অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ছায়ার মত মামা এগোচ্ছে গোয়ালের দিকে।

এক থাবড়ায় গোয়ালের গোলপাতার আগলটা পড়ে গেল।

গোয়ালের জোয়ান বলদটা শিং নিচু করে ফোঁস-ফোঁস করে উঠল। গাইগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে কাঁপছে। মামা গুঁড়ি মেরে বসল। ল্যাজটা তার চাবুকের মত ডাইনে বাঁয়ে নড়ছে।

বলদটা বলল, 'আর এগিয়ো না মামা! এখুনি গাঁ-গাঁ করে দু-পেয়েদের ডেকে দেব!'

মামা বলল, 'দু-বগলে দুটো দু-পেয়েকে নিয়ে যাব।'

'জান, ওদের গাদা-বন্দুক আছে?'

'হ্যাঁ, একবার একটা গাদা-বন্দুক চিবিয়ে দেখেছিলুম। রস নেই, কস নেই, খালি ধুম-ধড়াস!'

বলদ বলল, 'তোমার লজ্জা করে না, মামা, বনের বাঘ হয়ে ঘরের গরু খেতে এসেছ?'

'ক্ষিদে পায় যে!'

'হরিণ ধরতে পার না।'

'গোদাগুলোর জ্বালায় হরিণ ধরার জো আছে? শুধু যে গাছের

ওপর থেকে বলে দেবে তাই কি? আবার মুখ ভেংচাবে! বয়স হল, ছোকরা হরিণদের সঙ্গে ছুটে পারি না।'

'কিন্তু'...

কিন্তু আর বলা হল না বলদের। ততক্ষণে মামার এক থাবড়া পড়েছে কাঁধে। আর বলদটাকে পিঠে ফেলে নদী সাঁতরে পার হয়ে গেল মামা।

বুড়ো পণ্ডিত বলল, 'মামার গায়ে জোর দেখেছিস! একটা আস্ত বলদ পিঠে করে নদী পার। চল পেসাদের জোগাড় দেখি।'

মামা কিন্তু আস্ত বলদটা নিয়ে উঠতে পারেনি। নদী-পারের মাশুল দিতে হয়েছে কুমিরদের, দুখানা পেছনের ঠ্যাং।

দু-পেয়েরা আর কত সয়?

যে বন তারা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল একটুখানি, সেই বন উঠে আসে ঘরে। তরমুজ-ক্ষেতে শেয়াল, হনুমান। আখ-ক্ষেতে হরিণ, ধানের ঢেউয়ে চড়াই আর টিয়াপাখি। সবচেয়ে বড়, গোয়ালেবাঘ।

তাই ধানক্ষেতে দড়িতে টিন বেঁধে পাখি তাড়ানো হতে লাগল। আর তরমুজ-ক্ষেতে বসল পাহারা। বিচ্ছিরি আলথাল্লা-পরা লাঠি হাতে কাঠিপানা একটা লোক। মুখখানা তার কেলে হাঁড়ি, শাদা-শাদা বড় চোখ আর দাঁত-খিচোনো ভয়ঙ্কর হাসি মুখে। গোদারা পালিয়ে গেল।

পণ্ডিতেরা কিন্তু জানে যে ওটা দাঁতই খিচোয় কিন্তু নড়েও না চড়েও না, কাঠের পুতুল কাগতাড়ুয়া। তাই পণ্ডিতেরা রাতের আঁধারে দু-একটা তরমুজ শিকার না করে পারে না। মামারও সহজ শিকারের নেশা চেপে বসে।

তরমুজের ফালির মত লাল চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

লক্ষ্মীপ্যাঁচা আকাশে ছায়ার মত যেতে-যেতে মাটিতে আর-একটা ছায়া দেখে বলে উঠল, 'মামা, যেও না, যেও না!'

মামার তখন জিভ দিয়ে লালা ঝরছে। মিষ্টি গাই-গরুর গন্ধ।

পণ্ডিতেরা বলল, 'মামা, সাবধান!'

মামা তখন নিঃশব্দে গোয়ালের গোড়ায়। সব নিস্তব্ধ। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, শুধু আকাশে ঝমকাচ্ছে অসংখ্য তারা। হঠাৎ গোয়ালের মাথায় খুট্ করে একটু শব্দে মামা চমকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে কত আলো, কত মশাল। গাদা-বন্দুক গর্জে উঠল—ধুম ধড়াস! মামা দাঁত খিচিয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠেছিল। মাটিতে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিঁধে গেল অনেকগুলো সড়কি, বল্লম। মামার লেজটা শুধু কাঁপতে-কাঁপতে তখনও আছড়াচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে, বাঁয়ে ডাইনে।

নদী বয়ে চলে দিগন্তে আথাল পাথালের পানে। নদীর পাড়ে কুমির হাঁ করে পড়ে থাকে, মামা আসবে মাশুল নিয়ে। নদীর ওপারে রহস্যমাখা বন থম-থম করে। আর বন কাঁপিয়ে শোনা যায় মামার হুঙ্কার।

শেয়াল পণ্ডিতেরা ল্যাজ গুটিয়ে ছুটতে ছুটতে বলে, 'বুড়ো মামা খতম! বড় মামা হাঁকছে বনে।'

পৃথিবী উষার দিকে মুখ ফিরিয়ে রহস্যময় মুচকি হাসতে থাকে।

গোয়াল ঘরে বাঘ

এপারে ধূ-ধূ সবুজ ধান-ক্ষেত আকাশের কোলে ধীরে ধীরে মিশে গেছে, আর ওপারে দিগন্ত-ছড়ানো সুঁদরি বন গড়িয়ে চলে গেছে কালাপানির কোলে। মাঝখান দিয়ে ভৈরব কল্লোলে ছুটে চলেছে আমাদের বাংলার প্রাণ···সারা ভারতের প্রাণধারা সহস্রমুখী গঙ্গার এক ধারা। নদীর দু-পাশে ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, তার মাঝে-মাঝে জায়গায়-জায়গায় শুকনো শাদা বালি চাঁদের আলোয় চকচক করে।

দিগন্ত-ছড়ানো ক্ষেতের মাঝে মাঝে ছোট-ছোট কুঁড়ে-ঘরগুলোকে যেন খেলাঘরের মত অলীক বলে মনে হয়। এই সেদিনও নদীর এপার ঐ বনভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষের ক্ষুধার কাছে বনকে জমি ছাড়তে হয়। বন্যেরা তাই হানা দেয় মাঝে-মাঝে মানুষের খাদ্যে।

আসে হরিণের দল চুপিচুপি দল বেঁধে চষা শস্যের লোভে-লোভে। আসে বুনো-শুয়োরের পাল তাদের ছানা-পোনা নিয়ে।

পোষা গরুর পালের এখানে খাদ্যের অভাব নেই। গলায় ঘণ্টা ঢং-ঢঙিয়ে তারা মাঠে-মাঠে চরে বেড়ায় আর মাঝে-মাঝে হঠাৎ চমকে নদীর ওপারের শ্যামল কৃষ্ণায়মান বনের পানে তাকায়। কোন আদিম বন্য-স্বাধীনতার তৃষ্ণা কি তখন জেগে ওঠে তাদের চোখে ?

নদীর জল বর্ষায় ফুলে খলখলিয়ে খালে ফাঁড়িতে ঢুকে পড়ে; সেইসঙ্গে নোনা নদীর মাছের ছানা-পোনারা সে-সব খালে বিলে আশ্রয় নেয় আর বর্ষার মিঠে জলে হু-হু করে বেড়ে উঠতে থাকে। গাছের দল ভিড় করে ঝুঁকে দেখতে থাকে কোন্ অনাদি আদিম কাল থেকে প্রকৃতির এই বন্য লীলা। মাছরাঙার দল রঙের চিকুর হেনে

জলে জলে ছোঁ মেরে যায়। ভোঁদড়, ভাম জলার আশে-পাশে ঝোপে-ঝাড়ে লোভী উঁকি মারে আর গোঁফ চুমরোয়।

নিঃশব্দে সাবধানী চঞ্চল পায়ে হরিণের দল যখন আসে, মঙ্গলা-গাই গোয়াল থেকেও তাদের অস্তিত্ব জানতে পারে, কিন্তু কোন চাঞ্চল্য অনুভব করে না। মাঝে-মাঝে এক-একটা বাঘও ছটকে চলে আসে লোকালয়ে শিকারের লোভে। তখন বহু আগে থেকেই ভয়ের একটা শিহরণ বয়ে যায় মঙ্গলার শিরদাঁড়া বেয়ে। সে অকস্মাৎ গোয়ালের মধ্যে মহা দাপাদাপি লাগিয়ে দেয়। চাষীরা বলে, মঙ্গলাটা দুষ্ট গরু। কিন্তু মঙ্গলার এই দুষ্টত্বের একটা ইতিহাস আছে।

সেটা তার ছেলেবেলার কথা। সে তখন তার মায়ের পিছু-পিছু দিগন্ত-খোলা মাঠে খেলে বেড়ায়। গরুর দলের গলার ঘণ্টাগুলো তালে-তালে বেজে চলে—ঢং ঢং—ঠং ঠং; নীল আকাশের পশ্চিম কোলটা নদীর ওপর হেলে পড়ে আস্তে আস্তে রাঙা হয়ে উঠতে থাকে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে, নদীর জলে প্রকাণ্ড একটা কালো কিসের মাথা যেন ভেসে আসছে। মঙ্গলার তখনও বোঝবার বয়স হয়নি। আকাশে ল্যাজ তুলে সে তখনও লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ গরুর পালে একটা ত্রস্ত পালানোর সাড়া পড়ে যায়। গলার ঘণ্টা-গুলো তাদের পাগলা-ঘণ্টির মত বেতালা বেজে উঠতে থাকে। আর, সব ছাপিয়ে হঠাৎ আকাশ-কাঁপানো এক গর্জন। মঙ্গলা কাঠের মত দাঁড়িয়ে যায় আর দেখে, তার মা পাগলের মত ছুটে আসছে তার দিকে। আবার একটা গর্জন, আর সভয়ে মঙ্গলা লক্ষ্য করে, একটা ডোরা-কাটা প্রকাণ্ড জানোয়ার বিদ্যুতের মত তার মায়ের পিঠে লাফিয়ে পড়ে। খানিকটা আর্তনাদ এবং গর্জন। চাষীর দলের ব্যস্ততা দূর থেকে দেখা যায়। মঙ্গলা সভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটতে থাকে। সেই থেকে তার মাকে আর দেখে নি মঙ্গলা। তারপর বহুদিন চলে গেছে। দেখতে-দেখতে মঙ্গলা বড় হয়ে উঠেছে। এই সেদিন তার নিজেরও একটা ধবধবে শাদা

বাচ্চা হয়েছে, কেমন নরম তুলতুলে ! তার নিজের মায়ের কথা কবে ভুলে গেছে মঙ্গলা। ভুলে গেছে তার মাকে বাঘে-নেওয়া। কিন্তু সেই ডোরা-কাটা ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার গায়ের একটা ঝাঁঝালো গন্ধ আজও তার মেরুদণ্ডে একটা ভয়ের শিহরণ এনে দেয়। আর এই বনভূমির পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে নানা জানোয়ার হানা দেয়। তার মধ্যে বাতাসে বাঘের অতি ক্ষীণতম গন্ধও মঙ্গলাকে তাই অতি তীব্র-ভাবে চঞ্চল করে তোলে। কিন্তু ধূর্ত বাঘের কাছে মঙ্গলা একবার পরাস্ত হয়েছিল। সেই কথাই আজ তোমায় বলি।

*　　　　*　　　　*

নিশুতি রাত। আকাশে চাঁদ নেই। উদাস, আদিম এই পৃথিবীর কোনটুকুর ওপর চেয়ে আছে আকাশের সহস্র-সহস্র চোখ। এমনি রাতে কতদিন বাঘমশাই মতলব করেছেন চুপি-চুপি গোয়ালের বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ার জন্যে। কিন্তু ঐ গোয়ালের একটা গাইয়ের যেন হাজারটা কান আছে! সে বহু দূর থেকেই বাঘের অস্তিত্ব টের পেয়ে মহা দাপাদাপি লাগিয়ে দেয়, আর দু-পেয়ে মানুষগুলো জেগে ওঠে। আগুনের বাতিগুলো জ্বলতে-জ্বলতে এদিক-ওদিক আনাগোনা করে। বাঘমশাই বিফল মনোরথে ফিরে যান। আগুনকে ভয় করে না, এমন জানোয়ার কোথায়?

কিন্তু সেদিন একটা দমকা হাওয়া চলেছে লোকালয় থেকে বন-মুখে। ধুলো আর পাতার রাশ অন্ধকারে পাকিয়ে-পাকিয়ে আকাশে উঠেছে। মঙ্গলা মাঝে-মাঝে ঘুম-চোখে তার নবজাত বাচ্চার গা চাটছে। আজ কি আসবে হরিণের দল ক্ষেতের ভেতর? আর— আর যদি আসে সেই ভয়ঙ্কর ডোরা-কাটা জানোয়ারটা—কেমন করে বাঁচাবে সে তার বাচ্চাকে? নাঃ, বাতাসে কোন গন্ধ নেই, সব চুপ-চাপ। মাঝে-মাঝে দূর—দূর ক্ষেতের থেকে ভেসে আসছে— 'হু-উ-উই'—দু-পেয়ে মানুষের হরিণ তাড়ানোর শব্দ।

হঠাৎ বেড়ার ওপর ও কী প্রচণ্ড শব্দ? অন্ধকারে ও-দুটো নীল

মণির মত কী জ্বলছে? আর—আর সেই তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ না? নিশ্চয় ঐ ভয়ঙ্কর শত্রুটা তারই বাচ্চাকে নিয়ে যেতে এসেছে! আজ মঙ্গলার মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল না, বয়ে গেল ক্রোধ আর ঘৃণার একটা স্রোত। নিমেষে ঘটে গেল এ-সমস্ত ব্যাপার। বাঘটা মহা চালাক, এ-পর্যন্ত সে একটুও শব্দ করেনি পাছে দু-পেয়েগুলো ধেয়ে আসে। নিঃশব্দে সে লাফ দিয়েছে কি না-দিয়েছে, শূন্য থেকেই



একজোড়া শিং তার শরীরে বিঁধে সজোরে তাকে গোয়ালের বেড়ার গায়ে ঠেসে ধরল। সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল বাঘের ভয়ঙ্কর গর্জনে। থাবার পর থাবার আঘাত মঙ্গলার নরম কাঁধের পেশীগুলো ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। কিন্তু তার চোখের সামনে দিয়ে ঐ ঘৃণ্য জানোয়ারটা নিয়ে যাবে তার বাচ্চাকে? রক্তের স্রোত ফিনকি দিয়ে ভরিয়ে দিল মঙ্গলার চোখ মুখ দেহ। পায়ে তার বল নেই, কাঁপতে-কাঁপতে সে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল মাটিতে,—চোখে তার হাজার

তারা কাঁপছে, যেন হলদে-হলদে আগুনের স্ফুলিঙ্গ! কিন্তু মাথার চাপ সে আলগা করে নি, বাঘকে দেয় নি এতটুকু অবসর কিলবিলিয়ে বেরিয়ে যাবার। তারপর গোঙানি আর গর্জনে ভবে উঠতে লাগল আকাশ। ধেয়ে এল দু-পেয়েরা লাঠি আর মশাল নিয়ে। মঙ্গলা তখন মরে গেছে, বাঘকে দুই শিঙে বেড়ায় পিষে রেখে।

তার সান্ত্বনা এইটুকু যে, বাঘকে আর প্রভাতের সূর্যালোক দেখতে হয়নি।

আইবেক্স আর মৌমাছিদের কাহিনী

বিস্তৃত পাহাড়ের গায়ে বন যেখানে ঘন-কৃষ্ণ শ্যামল, ওপর থেকে দেখতে গেলে যেখানে বনের গায়ে প্রতিহত হয়ে সূর্যের আলো ও মানুষের দৃষ্টি সমানভাবে ঠিকরে ফিরে আসে, সেইখানে বনের ভেতর থেকে একটা ভীত উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বনের মাথা থেকে পত্-পত্ করে আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাদা বকের দল। আকাশ স্নিগ্ধ, রৌদ্রসিক্ত, ঘন নীল। সেই আকাশের সমুদ্রে অনড় পাখা ভাসিয়ে, ঘুরতে-ঘুরতে আর ওপরে উঠতে-উঠতে পাঁশুটে কালো চিল তারস্বরে ডেকে উঠল—যে চোখ আঁধারে জ্বলে, যে কানে ভেসে আসে দূর জানোয়ারের পায়ের শব্দ, যার ঘ্রাণে ধরা পড়ে শত্রুর বাসস্থান আর যার উরুতে থাকে বাতাসের বেগ, সে-ই শুধু বনে ছোটার যোগ্য।

চিলের ডাক মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই বনের ভেতর থেকে কালো বাঘের গম্ভীর হুঙ্কার কাঁপিয়ে তুলল এদিকের পৃথিবী। সে ডাকে জয়ের উল্লাস, আর শিকারকে মুঠোর মধ্যে পাওয়ার পরম তৃপ্তি। এইবার দেখা গেল তাদের। নড়বড়ে ত্রস্ত পায়ে প্রাণপণে ছুটে চলেছে একটা আইবেক্স—পাহাড়ে ছাগল, আর পেছনে লাফের পর লাফে মাঝখানের ব্যবধান কমিয়ে এগিয়ে আসছে একটা কালো হিংস্র প্যান্থার।

আইবেক্স ছাগলেরা বেশ বড় জানোয়ার। আকৃতির দিক দিয়ে তারা অনেকটা মাঝারি আয়তনের হরিণের মত। কিন্তু সমতল জমিতে হরিণের মত ছোটার ক্ষিপ্রতা তাদের নেই। কারণ আইবেক্স ছাগলদের শরীরের সামনের অংশটা অত্যন্ত ভারি। তার তুলনায় মাথাটা একটু যেন ছোট; আর সেই মাথার লোহার মত শক্ত ও বেশ

প্রশস্ত খুলি থেকে পেছন দিকে বেঁকে থাকে খুব পুরু সরু শিলাখণ্ডের মত একজোড়া অদ্ভুত রকমের শিং। সেই শিংদুটোর গোড়ার দিকটা যেন গাছের গুঁড়ির মত মোটা, তারপরে ক্রমশ সরু হতে-হতে ছুঁচলো হয়ে গেছে।

আইবেক্সটা বেশ সবল—প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য রয়েছে তার মধ্যে। পাহাড়ে জঙ্গলের পথঘাটগুলো এখনো রপ্ত হয়নি তার। দলে চলবার মত কৌশলেও পাকাপোক্ত হতে পারে নি, তাহলে বিপদের সময় কখনো দল ছেড়ে আসত না।

হঠাৎ প্যান্থারের তাড়া খেয়েই বেচারি দল থেকে ছিটকে পড়ে পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছে। ওদিকে ওদের দলপতি আইবেক্স আক্রান্ত হতেই দলটিকে নিয়ে টিলায় টিলায় লাফিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। আইবেক্স ছাগলেরা সমতল ভূমিতে বাঘের তুলনায় ভাল ছুটতে পারে না বটে, কিন্তু পাথরে পাথরে লাফিয়ে দ্রুতগতিতে পাহাড়ে চড়তে তাদের জুড়ি নেই।

এখন, এই বাঘের তাড়া-খাওয়া আইবেক্সটাও বাঘের পাল্লায় পড়ে তার ভুলটা বুঝতে পেরেছে—টিলার দিকে না উঠে নিচের পথে সমতল ভূমিতে এভাবে আসা মানেই যমের মুখে পড়া। এখানে বাঘের সঙ্গে কিছুতেই সে দৌড়বাজিতে পেরে উঠবে না। এই ভুল শোধরাবার জন্যেই এখন তাকে আবার সমতল ভূমি থেকে,—ঐ যে সামনেই টিলায় টিলায় পাহাড়টা মহাশূন্যে উঠে গেছে সেদিক পানেই ধাওয়া করতে হবে। তাই সে প্রাণপণে সেইদিকেই ছুট দিল। কিন্তু প্যান্থারটাও বড় কম চতুর নয়। সেও বুঝেছে—টিলায় ওঠবার আগে তার সঙ্গে তাকে বোঝাপড়া করতে হবে। সে যখন তার পাল্লার মধ্যে এসে গেছে, আর ভাবনা কী? অমনি তার মুখ থেকে বেরুল এক প্রচণ্ড গম্ভীর হুঙ্কার।

আইবেক্স ছাগলটার গায়ের লোমগুলো এই গর্জনে খাড়া হয়ে উঠল; বেচারা বুঝল যে, আর রক্ষা নেই। পাহাড়ের টিলা আর

বেশি দূরে নয়, ওখানে যেতে পারলেই সে নিরাপদ ; কিন্তু তার আর অবসর নেই—এখনই ঐ দুরন্ত শত্রু যমের মত তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। হঠাৎ তার মনে হল—এভাবে বেঘোরে মরার চেয়ে বাঘটার সঙ্গে সে একবার বোঝাপড়া করবে। বাঘের থাবা আছে, কিন্তু তার নিজের মাথাটায়ও যে একজোড়া শক্ত শিং আছে, সে-দুটো কি বাঘের থাবার চেয়ে কম শক্ত? না, আর সে পালাবে না! অমনি একটা প্রচণ্ড ক্রোধে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন ফুটে উঠল ; তারই আবেগে হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল বাঘটার দিকে ; তারপর করলে কি, কয়েক পা পিছনে হটে গিয়ে তারপরেই দারুণ বেগে তেড়ে ছুটে গেল বাঘটারই দিকে। তার মাথাটা তখন নিচু হয়ে গেছে, আর, মাথার খুলি থেকে নির্গত সেই ভীষণ দুটি শিং হয়েছে উদ্যত। সঙ্গে-সঙ্গে বাঘটাও লাফ দিয়েছে। এই সংঘাতে বুঝি পাহাড়ে জঙ্গল গম-গম করে কেঁপে উঠল! প্রায় একই সঙ্গে আইবেক্সটার ঘাড়ে পড়ল বাঘের একটা প্রচণ্ড থাবা ; আর জাগ্রতযৌবন পরাক্রান্ত আইবেক্সের মাথার সেই শিং-দুটোর প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল প্যান্থারের পেটে। পরক্ষণে গক্ করে একটা আর্ত আওয়াজ তুলে প্যান্থারটা ছিটকে পড়ল সাত হাত দূরে। আইবেক্সটার বুদ্ধি তখন খুলে গেছে ; আর সে দাঁড়ায় সেখানে? মুহূর্তের মধ্যে আবার ঘুরে সে টিলার দিকে ছুটল। তারপর দেখতে-দেখতে লাফিয়ে-লাফিয়ে টিলায় টিলায় উঠতে-উঠতে এমন স্থানে পৌঁছল, প্যান্থারের পক্ষে যে স্থান একেবারে অগম্য। তখন উপর থেকে আহত ছাগলটার কাঁধ বেয়ে টপ-টপ করে রক্ত পড়ছিল ; এদিকে নিচের বনে আহত বাঘের নিষ্ফল চীৎকারে বন কেঁপে উঠছিল। কিন্তু আইবেক্স ছাগলটা তখন তার নাগালের বাইরে।

উঁচুতে, অনেক উঁচুতে—পাহাড়ের মাথাটা যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে, সেখান থেকে নিচে তাকালে দেখা যায় পাহাড়ের নিচের অংশগুলো শ্যামলতর হতে-হতে ঘন-কৃষ্ণ ধোঁয়ার মত হয়ে পৃথিবীটাকে যেন ছেয়ে ফেলেছে। উপরের সেই ঘন-কৃষ্ণ টিলার বুক

চিরে একটা পাহাড়ি ঝরনা ঠিক যেন বিদ্যুতের মত ঝলসাচ্ছে। আর সেই ঝরনাই বহু নিচের সেই সমতলে রুপোলি ধারায় ঝির-ঝির করে গড়িয়ে পড়ছে। উপরের পৃথিবী নিঃসঙ্গ, পাথরের পর পাথরের চাঁই, আর তারই মাঝে-মাঝে এক-একটা স্তূপ যেন যোগীব মত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রয়েছে। আর দূরে-দূরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছে এক-একটা পাহাড়ে-গাছ।

বাঘের থাবায় আহত অবস্থায় সুউচ্চ পাহাড়ের এই নির্জন অংশে প্রাণের দায়ে উঠে এসেছিল আইবেক্সটা। এখানে পাহাড়ের একটা মাথা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে শূন্যে ঝুঁকে পড়েছে, তার ওপর আরও একটা পাথরের চাঁই ছাতার মত হয়ে স্থানটাকে আচ্ছাদন করায়, সেটাকে একটা গুহার মত দেখাচ্ছে। তার ভেতরটা যেমন অন্ধকার তেমনি ঠাণ্ডা। নিরাপদ আশ্রয়-স্থান খুঁজতে খুঁজতে আইবেক্সটা সেই গুহায় ঢুকে পড়ল। যেমন তার ঢোকা, অমনি বোঁ-বোঁ রবে উঠল মিশ্র ধ্বনি, আর ক্রমশ সেটা হতে লাগল গভীর ও তীব্রতর। ছাগলটা বুঝতে পারল না কী ব্যাপার, আর তখন তার বোঝবার মত অবস্থাও নয়।

সেই গুহাটার ভেতরে, ওপরের প্রকাণ্ড ছাতার মত সেই ছাদের প্রায় সমস্তটা জুড়ে ছিল একটা বিশাল মৌচাক। পাহাড়ের এই বুদ্ধিমান মৌমাছিরা অনেক ভেবে-চিন্তে দুর্গম পাহাড়ের এই নিরাপদ স্থানটিতে তাদের মধুভাণ্ডারটি নির্মাণ করেছিল। এ পর্যন্ত কেউ এখানে এসে তাদের শান্তিভঙ্গ করে নি—পরমানন্দেই তারা দীর্ঘকাল ধরে মধু সঞ্চয় করে এসেছে। এই প্রথম তাদের বাসস্থানে এই আগন্তুক উপস্থিত। সঙ্গে-সঙ্গে শিঙা বেজে উঠল; শত কণ্ঠে প্রশ্ন উঠল—'কে তুমি? জবাব দাও। শত্রু না বন্ধু?'—ক্লান্ত আহত আইবেক্সটা গুহামধ্যে এসেই তার মধ্যে দেহ ঢেলে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক প্রহরীরা বোঁ-বোঁ শব্দে চীৎকার তুলল—'সামাল, ভাইসব, সামাল!'



দেখতে-দেখতে আইবেক্সটাকে ছেয়ে ফেলল মৌমাছির দল। কিন্তু ক্লান্ত আহত আইবেক্সটার তখন আর নড়বার ক্ষমতাও ছিল না। না করল সে কোন রকম প্রতিবাদ, না উঠল তার মুখ থেকে কোন আর্তনাদ। কামড়াতে কামড়াতে মৌমাছিরাও শেষে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিংবা হয়ত ছাগলটার অবস্থা দেখে তখন মৌমাছিদের মায়া হল। তখন আবার ডঙ্কা বেজে উঠল—আবার উঠল বোঁ বোঁ শব্দ। ছাগলটাকে ছেড়ে মৌমাছির দল উঠে গেল। তারা বুঝল এ বেচারি তাদের শত্রু নয়। না বুঝে কামড়াবার জন্যে বোধহয় আপশোসও করল তারা তাদের ভাষায়।

পাহাড়ি ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে আসে কমলা ফুলের সুবাস। মৌমাছি কারিগরেরা গান গাইতে-গাইতে ছুটে চলে কমলা-মধুর খোঁজে। প্রভাতী সূর্যের আলোয় পাহাড়ের তুষারভরা চুড়োগুলো রত্নমুকুটের মত ঝকমক করতে থাকে। নিচের দূর বন থেকে চড়া, উঁচু, কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে লঙ্গুর বানরদের খেয়াল-খোলা ডাক ভেসে আসে —উকু, উ-উক্কু, হু-উক্কু-উ! আকাশে শাদা পাখার ঢেউ তুলে উড়ে যায় বকের সার। গুহার ভেতর নিচে শুয়ে থাকে আইবেক্স ছাগলটা, আর ওপরে মধুচক্রের ভেতরে মৌরানীকে ঘিরে মৌমাছি দলের বৈঠক চলে। মৌমাছি সৈন্যেরা সজাগ থাকে। তিন দিন তু-রাত আইবেক্সটা ওঠে নি। মৌমাছির হুলের বিষে বোধহয় বাঘের নখের বিষ ক্ষয় হয়ে গেছে। বিষে বিষক্ষয়! বাঘের থাবার ক্ষত এখন শুকিয়ে এসেছে।

আইবেক্স এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। গুহা থেকে বেরিয়ে সে আহার্য খুঁজে নেয়। খাদ্যের অভাব এখানে নেই। তাকে উঠতে দেখে মৌমাছিরা প্রথমে চঞ্চল হয়েছিল, কিন্তু যখন দেখল বেচারা নিছক অহিংস্র, তাদের চাকের দিকে লক্ষ্যই নেই,—তখন তারা যেন নিশ্চিন্ত হল।

এমনই সময় একদিন প্রত্যুষে গুহার মধ্যে মৌমাছিদের চাক থেকে আবার রণডঙ্কা বেজে উঠল—বোঁ, বোঁ, বোঁ! অর্থাৎ—সামাল

ভাইসব, হুসিয়ার! শত্রু এসেছে! ছাগলটার ঘুম ভেঙে গেল তাদের চীৎকারে। চোখ খুলতেই সে দেখল—গুহাটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে, আর মৌমাছিরা নিরুপায় হয়ে তাদের চাক ছেড়ে উড়ে পালাচ্ছে।

ব্যাপারটা হচ্ছে—একটা খড়িয়া কোন রকমে এই মধুচক্রটির সন্ধান পেয়েছিল। এই খড়িয়ারা জঙ্গলের মানুষ। জঙ্গল থেকে মধু, মোম, ধুনো প্রভৃতি সংগ্রহ করাই তাদের ব্যবসা। ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে এরা মৌচাক ভেঙে নিয়ে যায়। এই খড়েটাও মধুর লোভে ভোরে-ভোরে এসে গুহার মধ্যে ধোঁয়া দিয়েছে।

মৌমাছিদের জীবন অদ্ভুত সঙ্ঘবদ্ধ শৃঙ্খলাময়। তাদের কারিগরেরা মধু সংগ্রহ করে চাক বাঁধে, সৈন্যেরা পাহারা দেয়, আক্রমণ করে, যোঝে, আর রানী মৌমাছি ডিন পাড়ে। বাচ্চাদের পালে কারিগরেরা। মৌমাছিদের সৈন্যদের ভয় পায় না—এমন খুব কম প্রাণীই আছে। কিন্তু ধোঁয়ার কাছে আর আগুনের কাছে তারা কী করবে? গুহাটা যতই ধোঁয়ায় ভরে উঠতে থাকে, ছত্রছান হয়ে পালাতে থাকে মৌমাছির দল। আর গুহার মুখে ধেয়ে আসে একজোড়া কালো পা। সে দুটো পা এই খড়িয়াটার। ওঃ! এত বড় চাক, তায় আবার কমলার মধু—আনন্দে খড়িয়াটার বুক ফুলে ওঠে। চোখদুটো পরিষ্কার করে হাত বাড়িয়ে চাক ভাঙতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে গুহার মুখে এসে ছিটকে পড়ে। সেখান থেকে সভয়ে চোখদুটো কপালের দিকে তুলে দেখে—গুহার মধ্যে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে একটা বাঁকানো চওড়া খুলির ওপর ঠিক যেন ইস্পাতের তৈরি একজোড়া ওল্টানো শিঙের পাশ দিয়ে ইঞ্জিনের লাল আলোর মত দুটো চকচকে চোখ তার দিকে এগিয়ে আসছে। অতি কষ্টে খড়িয়া তখন লাফিয়ে উঠে উঠি-পড়ি অবস্থায় পাহাড় থেকে নামতে থাকে।

ধোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আইবেক্সটা বুঝতে পেরেছিল, কি যেন একটা

বিপদ আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই খড়িয়াটাকে দেখতে পায়। তারপরই দু-পা পেছিয়ে তাল ঠুকে যেই তৈরি হয়ে দাঁড়ায়, সেই সময় খড়িয়া চাকে হাত বাড়িয়েছে। অমনি ঝড়ের মত তেড়ে এসেই ঝাড়ে তার সাজ্ঘাতিক ঢুঁ। মৌমাছিরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আইবেক্সটার ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। তাদের এত কষ্টের চাক ও তাতে বহুদিনের সঞ্চিত মধু তাদের এই পরম বন্ধুর কৃপাতে রক্ষা পেয়েছে।

ওপর পাহাড়ে শিকার করে পাহাড়ি নেকড়েরা। নেকড়েদের দলপতি ক-দিন থেকে লক্ষ্য করছে—একটা আইবেক্স পাহাড়ের গুহাটা থেকে বেরিয়ে আসে আর সারাদিন চরে আবার সন্ধ্যায় এসে ঢোকে গুহাটায়। নেকড়ে দলপতি জানে, এই পাহাড়ের টিলাময় জায়গায় আইবেক্সটাকে শিকার করা যাবে না। একবার তাড়া খেলেই টিলায় টিলায় লাফিয়ে-লাফিয়ে উঁচুতে উঠে যাবে। তখন তার নাগাল পাওয়া শক্ত। তাই সেদিন নেকড়ে দলপতি রাত থাকতে নিঃশব্দে গুহার মাথায় পাথরটার ওপর গুঁড়ি মেরে ওৎ পেতে বসে ছিল। আইবেক্সটা বেরোলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আনে কমলা ফুলের সুবাস। মৌচাকে সাড়া পড়ে। মৌ-কারিগরেরা জেগে উঠে গিয়ে বসে আইবেক্সটার শিঙের ওপর। গুন-গুন করে গান করতে থাকে। গান গেয়ে তারা যেন বলতে চায়—ওঠো ওঠো! কমলা ফুলের ডাক এসেছে!

আইবেক্সটা শিং নাড়া দেয়, ঝাঁকুনি দিয়ে শরীরের পেশীগুলোকে সজাগ করে তোলে. তারপর বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়। মৌমাছি কারিগরেরা গান-গাইতে-গাইতে ধীরে ধীরে গুহার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ তীরবেগে একটা কারিগর ফিরে আসে চাকে। তারপর আরও একটা, আরও একটা। অমনি শিঙা বেজে ওঠে—বোঁ-ও-ও!

মৌচাকে বসে বৈঠক। মৌচাকের সৈন্যরা সজাগ সতর্ক হয়ে ওঠে। ঘোর রোলে রণডঙ্কা বেজে ওঠে—বোঁ-বোঁ-বোঁ-ও!

সমগ্র মধুচক্র কাঁপিয়ে রণহুঙ্কার তুলে দলে-দলে মৌবাহিনী ছুটে চলল—যেখানে সেই হিংস্র নেকড়েটা ওত পেতে ছিল ছাগলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে।

দেখতে দেখতে চারিদিক দিয়ে দলে-দলে মৌমাছি সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে নেকড়েটারই ওপরে। পাহাড় কাঁপিয়ে ওঠে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন



আইবেক্সটা এতক্ষণ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বোধহয় ভাবছিল—আবার কী হল? কেন এভাবে হঠাৎ রণডঙ্কা বাজে?

বাঘের গর্জন শুনে তারও হুঁস হল—সেও সতর্ক হয়ে গেল।

—বোঁ-ও-ও! বোঁ-ও-ও!

নেকড়েটার গায়ের পাঁশুটে হলদে চামড়ার ওপরে যেন কালো

কম্বলের একটা আস্তরণ পড়ল! অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে অতঃপর ছুট দিল। মৌমাছির দলও গর্জন তুলে তার পেছনে-পেছনে তাড়া করে ছুটল। ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ পা ফসকে যায় নেকড়েটার।

একটা মৃত্যু-কাতর চীৎকার,—নিচে, আরও নিচে মিলিয়ে যেতে থাকে।

শীত কেটে গেলে পাহাড়ে বসন্ত দেখা দেয়। আইবেক্সটা এরই মধ্যে দল তৈরি করে নিয়েছে। এখন সে সদলবলে গুহার মুখে চরে। তার দলে এখন অনেকগুলি ছাগল। আর সে-ই দলপতি। মৌমাছিরা এখন নেই। শীতের মুখে উড়ে গেছে তারা। কিন্তু আইবেক্সটা জানে মৌমাছিরা ফিরে আসবে।

দূরে পাহাড়ের চুড়োয় বরফ গলতে শুরু করেছে। উত্তর দিকে উড়ে চলেছে বুনো হাঁসের দল—তাদের কণ্ঠে আনন্দের গান—পাখায় ঘরমুখো টানের বিদ্যুৎ গতি। নিচে পাহাড়ের গায়ে ফুটেছে রকমারি ফুল, তাদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে, নিমন্ত্রণের লিপি পাঠিয়ে দেয় মৌমাছিদের কাছে।

মহারাজ

নায়াশা হ্রদের ধারে লম্বা লম্বা আসিসি ঘাসের ভেতর মহারাজের আস্তানা। নায়াশার পশ্চিম পাড় বেয়ে কৃষ্ণ আফ্রিকার সমতল মালভূমি দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে। আসিসি ঘাসের মাথায় মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুঁড়িওলা গাছগুলো ডালপালা ছড়িয়ে হ্রদের পাড় বেয়ে বেয়ে সৃষ্টি করেছে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সেই জঙ্গলে থাকে সিংহরাজ, মহারাজের পরিচিত কতরকম প্রাণী। হ্রদের জলে ডুবে থাকে জলহস্তীর পাল। ফ্লেমিঙ্গোরা শাদা বুকের ভেতর লাল ঠোঁটগুলো গুঁজে একপায়ে ঘুমোয়। জিরাফের দল লম্বা ঘাড় উঁচু করে চরে বেড়ায়। শায়ার নদী হঠাৎ যেখানে বাঁক নিয়ে মার্চিসন জলপ্রপাত হয়ে ঝরে পড়েছে, সেইখানে থাকে যূথপতি জাম্বোর হাতির পাল। ক্বচিৎ কখনও ক্যানো বেয়ে আসে বল্লমধারী একরকম দু-পেয়ে কালো-কালো মানুষ। এদেরও চেনে মহারাজ। এরা তার পরিচিত জগতের প্রাণী।

দু-পেয়ে মানুষদের মহারাজ পছন্দ করে না। অনেক রকম জানোয়ারের সঙ্গে সে লড়ে দেখেছে। জিরাফেরা দেখতে ঐরকম প্রকাণ্ড হলে কী হয়, তার এক হাঁকেই তারা কাবু। হ্যাঁ, বল আছে বটে হাতিদের রাজা—জাম্বোর। কিন্তু ঐ দু-পেয়ে মানুষগুলো ভীষণ কুটিল। ওরা কখনও সমানে সমানে লড়তে জানে না।

মহারাজের মনে পড়ে, সে তখন ছোট। তার মা একবার কোথা থেকে একটা দু-পেয়ে মানুষ শিকার করে এনেছিল। আঃ, সে কী তার নোনা আস্বাদ! কিন্তু, দুদিনও গেল না।

পুবের ভারত মহাসাগর থেকে ঝোড়ো বাতাসের মাথায় ভেসে আসছে পুঞ্জীভূত মেঘের দল। জিরাফেরা মিশে গেছে বনের পাতায়

পাতায়। জলপ্রপাতের গর্জনে মিশে গেছে হাতির দলের বৃংহণ। হঠাৎ চারিদিক থেকে সে কী ভুতুড়ে আওয়াজ—ডুং ডুং! ডুং ডুং!

সেই আওয়াজ শুনেই তার মা লাফিয়ে উঠে আকাশে সিংহনাদ ছেড়েছিল—'মানুষ। মানুষ! দু-পেয়ে মানুষ! পালা সিম্বা, পালা!'

কিন্তু তারা পালাবে কোথায়? যেদিকে যায় সেই ভুতুড়ে শব্দ—ডুং ডুং! ডুং ডুং। আর, শব্দটা যেন গোল হয়ে হয়ে ক্রমশ বাড়তে লাগল। বনের ফাঁকে কে যেন—কারা যেন নড়ছে না? হঠাৎ তার মা ক্রুদ্ধ গর্জন করে প্রচণ্ড লাফ দিয়ে পড়ল কার ওপর। একটা মৃত্যুকাতর চীৎকার। তারপরে প্রচণ্ড শব্দে নানারকম বিজাতীয় গোলমাল। তারপর সেই কালো-কালো দু-পেয়ে মানুষের দল কিনা তার মাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলল!

সেই থেকে দু-পেয়ে মানুষগুলোকে পছন্দ করে না মহারাজ।

এর পরে কতগুলো বসন্ত কেটে গেছে। সিংহরাজ মহারাজের শরীরের পেশীগুলো সবল আর সাবলীল হয়ে উঠেছে, ঘাড় বেয়ে তার উপচে পড়ছে চকচকে পাঁশুটে কেশর—পায়ে এসেছে গতি। কী সুন্দর তার এই প্রশস্ত জংলা পৃথিবী!

সে এক বসন্ত। নানারকম পাখির কাকলিতে বনভূমি মুখর। মাথার ওপর সাঁই-সাঁই পাখা চালিয়ে উড়ে গেল ফ্লেমিঙ্গোর দল। দূরে উজ্জ্বল, রোদে-ভরা মাঠে চরছে জিরাফের পাল। সিম্বার ক্ষিদে তখন চনচনে হয়ে উঠেছে। 'হু উ ম্।' করে প্রবল একটা গর্জন করে মহারাজ লাফিয়ে পড়ল জিরাফের দলের উদ্দেশে। ধুলোর রাশ উড়িয়ে সভয়ে ছুটে চলল ছত্রভঙ্গ জিরাফের পাল। আর সেই জিরাফের প্রকাণ্ড দলটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে মহারাজ প্রথম বুঝে নিলে তার ক্ষমতা। সে এই বনের রাজা। আর-একবার চুপি-চুপি সে একটা গ্যাজেল হরিণের পেছনে তাড়িয়ে চলেছে। বন ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে। লতাপাতায় ঢাকা দীর্ঘ গাছের দলের মাথা

থেকে, থেকে-থেকে ভেসে আসছে লঙ্গুর বানরদের ডাক—'উকু—উ—উক্কু।'

হঠাৎ সপাং করে কি যেন একটা মহারাজের পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে-সঙ্গে যেন বুক ফেটে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার। ময়াল! ময়াল সাপ জড়িয়েছে তাকে! ক্রোধে এবং ভয়ে গর্জন করতে-করতে প্রাণপণে গড়াতে লাগল মহারাজ। ময়ালের প্রচণ্ড বেষ্টন ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে. কিন্তু গড়াতে গড়াতে হঠাৎ এক সময়ে সাপটার মাথাটা কাছে পেতেই প্রচণ্ড এক থাবা চালাল সে। তারপরে গর্জন আর হিস্-হিস্ শব্দে ভরে উঠল বন। আস্তে আস্তে কাবু হয়ে এল ময়াল। আর তার মরা দেহটার ওপর থাবা রেখে আকাশে মুখ তুলে সিংহনাদে জানিয়ে দিল মহারাজ তার বিজয়।

পুবের ভারত মহাসাগরের মেঘ আর পশ্চিমের অতলান্তিক মহাসাগরের মেঘে-মেঘে তখন ধাক্কা লেগেছে। ক্ষ্যাপা বাতাস পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরছে বনের মাথায়, গাছপালা আথাল-পাথাল। বিষুবরেখার প্রচণ্ড বর্ষা আনে বন্য প্রাণীর জীবনে শান্তি আর স্থৈর্য। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় মহারাজ দেখল, যূথপতি জাম্বো সদলবলে উত্তরে ছুটে চলেছে···পালাচ্ছে জেব্রা আর জিরাফের পাল। ব্যাপার কী?

হঠাৎ বন কাঁপিয়ে ও কিসের শব্দ?

একটা হাতির বাচ্চা শুঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠে ন্যাংচাতে লাগল কেন? এসব কী?

যূথপতি জাম্বোর ক্রুদ্ধ বৃংহিত ধ্বনিতে জানা গেল—মানুষ, মানুষ, দু-পেয়ে মানুষ! সিংহনাদ ডেকে উঠল মহারাজ—বন কাঁপিয়ে। এ বনে তারা মানুষ চায় না। এ বন তাদের। যুগ-যুগান্তর ধরে তারা এই বনে বেড়ে উঠেছে,—বাস করেছে তাদের নিজেদের হিংসা-ভালবাসা নিয়ে। কুটিল মানুষের অস্তিত্ব তারা সহ্য করবে না এখানে।

কিন্তু সেই থেকে শুরু হল বনে ধ্বংসলীলা। আর, মহারাজ অবাক হয়ে সেই প্রথম দেখল শাদা মানুষ...বাজনলা বন্দুক হাতে।

রাত গভীর। বনের ভেতর পড়েছে এক শাদা তাঁবু। আকাশের ছায়াপথে ঝকঝক করছে তারাদল। স্তব্ধ বন থেকে ভেসে আসছে নানারকম ভুতুড়ে আওয়াজ। হঠাৎ নিঃশব্দে অন্ধকারের ভেতর থেকে মহারাজ লাফিয়ে পড়ল তাঁবুর প্রহরীর ওপর। এমনভাবে আক্রমণ করল সে, যে দু-পেয়ে মানুষটা একটা টুঁ শব্দও করতে পারল না। এমনি করে সে পেছনে লাগল দু-পেয়ে মানুষের। যেখানে তাঁবু যায়, ঠিক নিঃশব্দে চুপি-চুপি অনুসরণ করে মহারাজ। তারপর রাতের পর রাত তাঁবুর প্রহরীরা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। মানুষের বুদ্ধির ওপর এ হস্তক্ষেপ মানুষ সইবে কেন?

আবার একটা তারাভরা কালো রাত। ঐ দূরে দেখা যায়, শাদা তাঁবুটার আবছা শাদা। গুঁড়ি মেরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে মহারাজ। ঐ তো পাগড়ি মাথায় প্রহরীটা পাহারা দিচ্ছে তাঁবুর সামনে। কিন্তু মহারাজ জানত না যে, ঐ প্রহরীটা সত্যি নয়। কাপড়-চোপড় সাজিয়ে একটা প্রহরীর মত মিথ্যে করে খাড়া করে রাখা হয়েছিল ওখানে। নিঃশব্দে লাফ দিল সে। হঠাৎ, একি? সভয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল সে। মানুষ? মানুষ কোথায়? লাফিয়ে পড়া-মাত্র তার পায়ের তলার মাটি গেল সরে। নিচে প্রকাণ্ড খাদ। আর সেই খাদের ভেতর পড়ে দুরন্ত ক্রোধে গর্জাতে-গর্জাতে আকাশ ভরিয়ে তুলতে লাগল মহারাজ।

বন্দী হল সিংহরাজ।

তারপর একটা হৈ-চৈ, দুপেয়ে মানুষগুলোর চীৎকার—'সিংহটা পড়েছে, পাজি সিংহটা গর্তে পড়েছে!'

এল মশাল, এল বল্লম। মহারাজ বন-কাঁপানো হুঙ্কার দিয়ে উঠল, লাফ দিল, নখ দিয়ে আঁকড়ে খাদের গা-গুলো ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাটিশুদ্ধ ঝরে আবার খাদের নিচে পড়ে গর্জাতে লাগল।

অনেকগুলো কালো মানুষ হয়ত তাকে তার মায়ের মত খুঁচিয়ে

মেরে ফেলত, কিন্তু একটা শাদা মানুষ এসে বলল, 'আঃ, চমৎকার সিংহটা! থাক আজ, কাল ওকে খাঁচায় পুরতে হবে। গর্তটা যথেষ্ট বড় আছে, পালাতে পারবে না। শুধু গর্তর ওপরে বড়-বড় কাঠের গুঁড়ি চাপা দিয়ে দাও।'

গর্তটার বৃত্তমুখের ওপর কাঠের গুঁড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একটুখানি ধোঁয়া-কালো আকাশ, আর সেই আকাশে রুপোকুচি তারারা ঝিকিমিকি করে। খাদের নিচে বসে সেই আকাশের পানে তাকিয়ে মহারাজ জিভ বের করে হাঁপায়। বন স্তব্ধ। শুধু মাঝে-মাঝে ভেসে আসে রহস্যময় ভুতুড়ে আওয়াজ। মহারাজ গুঙিয়ে ওঠে। এ কী বেড়া তার চারপাশে! তারপর গোঙাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় সে, কানদুটো তার খাড়া হয়ে ওঠে।

বহুদূর থেকে ভেসে-আসা হাতিদের রাজা জাম্বোর ডাক না? সে-ডাক হাতিদের ডাকছে—'হাতিরা জাগো! হাতিরা পা চালাও! আকাশের কালো-মোষের দল আসছে ক্ষেপে তেড়ে। আঁকা-বাঁকা বিজলির চাবুক তাড়া করেছে তাদের। সাগরের ঘূর্ণি-নিশ্বাস উঠেছে আকাশে। হাতিরা চল—চল!'

মহারাজ দেখল, আকাশের তারারা মুছে যাচ্ছে একে-একে, আর কানে তার বেজে উঠল দুরন্ত ঝড়ের আগের ঠাণ্ডা থমথমে স্তব্ধতা। উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানি-ডাক ডেকে উঠল সে—গ-র্-র্!

তারপরে সে কী ঝড়! পাগলা বন আথাল পাথাল। কোথায় গেল তাঁবু, কোথায় গেল কালো আর শাদা মানুষ? পালা, পালা! ফাঁকা জায়গা কোথায়? বড়-বড় গাছ ভেঙে পড়তে লাগল। আর, একটা গাছ পড়বি তো পড় একেবারে মহারাজের খাদের ভেতর। ওপরে ঢাকা গুঁড়িগুলোও পড়ল ভেতরে হুড়মুড়িয়ে।

মহারাজ কোনমতে কুঁকড়ে বাঁচিয়ে নিল নিজেকে, তারপরে এক-এক লাফে ভাঙা গাছের ডালে-ডালে পা দিয়ে এক লাফে বাইরে উঠে এল, আর ঝড়ের হুঙ্কারের সঙ্গে তার মুক্তির আনন্দের

হুঙ্কার মিশিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল আসিসি-ঘাসের নরম মখমল বনের পানে। আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত



বিদ্যুতের লিকলিকে একটা চাবুক ঢেউ খেলিয়ে চলে গেল। পেছনে তার বেজে উঠল আকাশের দামামা……

বনভূমি

হাতির পালের গোদা হাতিটা বলে, 'কেঁদো বেরালটা বড় শয়তান' আর কেঁদো বাঘ বলে, 'গোদা হাতিটাকেই একদিন জমি নেওয়াতে হবে।'

বেচারি বাঘ! খেটে খায়—শিকার তো আর দধীচির মত অস্থিদান করতে আসে না বাঘের মুখে! পেটের দায়ে দস্তুর-মত মেহনত করতে হয় বাঘকে—কত ফিকির ফন্দি, ধড়িবাজির মধ্যে দিয়ে। অবশ্য এই ছায়াঘেরা উত্তুঙ্গ পর্বতময় বনজগতে শিকারের পেছনে হাওয়ার মত ধাওয়া করার অদ্ভুত উন্মাদনাও যে ধমনীতে ধমনীতে রক্তধারার জোয়ার আনে না তাও বলা চলে না। ঝরনা পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সূর্যবিন্দু মেখে রামধনু হয়ে উড়ে যায়। অনাদি আদিম এই পৃথিবী আনমনা আকাশের আলোর পানে চেয়ে থাকে। আর নীল সেই আকাশ থেকে চিলের ডাক কেঁপে কেঁপে ভেসে আসে—'যার চোখ আঁধারে জ্বলে, যার কানে ভেসে আসে দূর জানোয়ারদের পায়ের শব্দ, যার নখ পাথরে বাজে না, যার উরুতে থাকে বাতাসের বেগ,—সে-ই শুধু বনে শিকারের যোগ্য।'

হাতিরা যখন এই বনে আসে নি তখন বাঘই ছিল এই বনের একচ্ছত্র অধিপতি। শিকারের পেছনে দৌড়োতে হলেও শিকারের অভাব ছিল না বনে। আর নেহাতই যেদিন শিকার ফাঁকি দিয়েছে তাকে, জলার পাড়ে গিয়ে বিফল হয়ে ফেরে নি সে।

জলাটা যেন জানোয়ারদের মেলা। পাহাড়ের মাথায় পশ্চিম আকাশে যখন সেরা পটুয়া তার বিষণ্ণ লাল তুলিটা বুলোতে থাকে,

আর বিগড়ি হাঁসেরা ডানা ঝাপটে ঝুপঝাপ জলে নেমে সারে ভেসে যায়, সাবধানে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে প্রথমে আসে চিত্রল হরিণের দল। নিঃশব্দে জল খেয়ে তারা তীরের মত লাফাতে লাফাতে মিলিয়ে যায়। তারপরে আসে বুনো শুয়োরের পাল ছানাপোনা নিয়ে। শজারুরা আসে তার পরে। হরিণের দল আসে পশ্চিম পাড়ে, পানকৌড়ি উড়ে যায় সূর্যাস্তের পানে, আর বকেরা এসে বসে গাছের মাথায়। শাদা হয়ে যায় গাছের মাথা—যেন স্তবকে স্তবকে শাদা ফুল ফুটে আছে। এমনি সময়ে জলার ধারে লম্বা ঘাসগুলোর মাথা নড়ে ওঠে—একটা চাপা আর্তনাদের মত খসখসে শব্দ! ভীরু হরিণের বুক গুরু-গুরু করে ওঠে—আচমকা লাফিয়ে উঠে সদলবলে দেয় ছুট—পিছন থেকে ভেসে আসে কোন ব্যথাতুর সঙ্গীর মর্মান্তিক ডাক। কোঁদো বাঘের শিকার জুটেছে।

এমনি চলছিল একাধিপত্যের রাজত্ব।

এরই মাঝে একদিন এল হাতির পাল। ওপরের পাহাড় পার হয়ে আকাশের পটে আঁকা সার বেঁধে শুঁড় দুলিয়ে এল তারা। দল চালিয়ে প্রথমে আসে একটা স্ত্রী হাতি; স্ত্রী হাতিগুলোর পেটের নিচে-নিচে কতগুলো বাচ্চার পাল। হাতিদের চলার নিয়ম ঐ। প্রথমে একটা স্ত্রী হাতি দল চালিয়ে চলে, দলপতি দাঁতাল পুরুষ হাতি তার দলকে আগলে পেছনে চলে। বিপদের গন্ধ এলেই এগিয়ে আসে দলপতি।

এই বাচ্চাওয়ালা হাতির পালকে দেখে বাঘের প্রথমটা আনন্দ ধরে নি। কত বাচ্চা! আর এক-একটা বাচ্চার কী ওজন! একটাকে শিকার করলেই—আর কিছুদিন শিকারের ভাবনা নেই।

হাতির দল খেয়াল-খোলা জানোয়ার। তারা খায় দায়, নাচে কোঁদে আর ঘুরে বেড়ায়। সব জায়গায়ই তাদের অবাধ গতি। তারা জানে না বা মানে না বাঘ-ডহর বা বাঘের ডেরা। জলার জলে নেমে তারা শুঁড়ে তুলে জলের ফোয়ারা ছাড়ে। গম্ভীর শাঁখের মত

বৃংহিত ডেকে অস্তমান সূর্যকে তারা আবাহন জানায়। আর পালিয়ে যায় চিত্রলের দল, সম্বরেরা সাবধান হয়ে যায়। বাঘের হয় অসুবিধা।

এমন একটা দিনে জলা থেকে উঠে মন্থর পায়ে হাতিরা চলেছে বনের ভেতর। সূর্য তখন পাটে বসেছে। হরিণদের দু-একটা বাচ্চা ছটকে ছটকে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে। হাওয়া উল্টোমুখো। বাঘ-ডহরের লম্বা ঘাসের মাথাগুলো কাঁপছে, হাতিরা লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ বন কাঁপিয়ে বাঘের শিকারী গর্জন, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা হাতির বাচ্চার করুণ আর্তনাদ!

বাঘটা মহা আনন্দে সেদিন নিঃশব্দে হাতির দলের পেছু নিয়েছিল, কিন্তু আক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ সেই বনের রাজা বাঘ প্রথম সভয়ে লক্ষ্য করল, ফোঁস-ফোঁস শব্দ করতে করতে সবেগে একটা পাহাড় যেন তার দিকে ছুটে আসছে! শিকার, না প্রাণ? মুহূর্তে শিকার ছেড়ে বাঘ হুঙ্কার করে গোদা হাতিটার মাথা লক্ষ্য করে লাফ দিল। কিন্তু ততক্ষণে দাঁতাল দলপতির শুঁড়টা বটগাছের গুঁড়ির মত সজোরে আঘাত করেছে তাকে। বাঘের মনে হল, তার ফুসফুসের সব নিশ্বাস যেন শেষ হয়ে গেছে! লাফ মেরে শূন্য থেকে আছড়ে মাটিতে পড়ে গেল বাঘ। আর হাতিটার গোদা পা যখন তাকে থেঁতলে দিতে নেমে আসছে, মুহূর্তে পিছলে সরে গেল সে, আর মাটিতে মুখ রেখে রাগে আর অপমানে গোঁ-গোঁ করতে করতে দিল ছুট।

সেই থেকে বাঘের সঙ্গে হাতিদের দলপতি দাঁতাল গোদা হাতিটার শত্রুতার সূত্রপাত।

হাতিরাও চিনেছে বাঘকে, বাঘও চিনেছে ওদের।

প্রখর গ্রীষ্মের ঝলসানো নীল আকাশের পানে তাকানো যায় না! জলার পাড়ে পাড়ে আশ্রয় নিয়েছে জানোয়ারেরা। হাতিরা জলে গা ডুবিয়ে আছে। হঠাৎ আকাশে শুঁড় তুলে ভাঙা-ভাঙা শাঁখের মত সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে হুড়মুড় করে জল থেকে উঠে এল

গোদা হাতি। তার ঘ্রাণে বাঘের গন্ধ এড়িয়ে যায়নি। ছোট-ছোট চোখছুটো তার লাল হয়ে উঠেছে। ছু-পাশের গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে ছুটে চলেছে সে। সব জানোয়ার তখন হাওয়া। বাঘের শিকার আবার ফস্কে গেছে, আর সে সামনে দেখে—উদ্যত শুঁড়টা তুলে উল্কার মত ছুটে আসছে সেই গোদা হাতিটা। বাঘও তখন তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার তীক্ষ্ণ বড়-বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, কানছুটো চ্যাপ্টা হয়ে মাথার সঙ্গে গেছে লেপটে, আর লেজটা চাবুকের মত এপাশ ওপাশ তুলছে।



একটা বন-কাঁপানো হুঙ্কার দিয়ে বাঘ লাফিয়ে পড়ল হাতিটার মাথায়। প্রাণপণে শুঁড় জড়িয়ে বাঘটাকে নামাতে পারছে না হাতিটা।

তার খুলি বেয়ে টস-টস করে রক্ত পড়ছে, বাঘ দাঁত বসিয়েছে মাথায়। কিন্তু হাতিদের দলপতি, সেও বুদ্ধিতে কম যায় না। বাঘটা-শুদ্ধ সবেগে সামনের গাছটায় মারল প্রচণ্ড এক ঢুঁ। আর চেপ্টে গেল বাঘটা। হাতির মাথা থেকে দাঁতের কামড় আলগা হয়ে গেল তার। সাপের মত কিলবিলিয়ে কোনমতে সে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। আর হাতিটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাতে লাগল। বাঘটাও বড়-বড় দাঁত বার করে খিচিয়ে উঠল, কিন্তু কেউ কাউকে আক্রমণ করল না আর। দুই শত্রুই বুঝেছে পরস্পরের বল।

তারপর চলার পথে দেখা হয়েছে বাঘের আর হাতির। ক্রুদ্ধ বৃংহিত গর্জন করে উঠেছে হাতি দলপতি, হুঙ্কার ছেড়েছে বাঘ। এ শত্রুতার শেষ নেই, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

ঝুমঝুম মল-পরা পায়ে বর্ষা নেচে গেছে বনের পাতায় পাতায়, তারপর এসেছে শরৎ তরুণের স্বপ্ন নিয়ে। গেল হেমন্ত—খাপছাড়ার মত। শীতে পত্রহীন গাছের দল রিক্ত করে দিয়েছে শোভাকে। আবার বসন্তে ফুলে ফলে উপছে উঠছে বনদেবীর ডালি।

বাঘের আর হাতির শত্রুতার শেষ হল না। দু-জনেই আশা করে, বোঝাপড়া হয়ে যাবে একটা।

আবার এসেছে বসন্ত। কোকিলের গলায় সুর ধরেছে।

পলাশ ফুলে ফুলে বনভূমি রাঙা। হঠাৎ নির্মেঘ আকাশে ডেকে উঠল বাজ। হাতিরা চমকে তাকাল—পালাচ্ছে হরিণ, পালাচ্ছে সম্বরেরা, শুয়োরের দল আর শজারুর পাল। বন কাঁপিয়ে বাজছে নাগারা চারদিক হতে, আর থেকে-থেকে গর্জে উঠছে বন্দুক। হাতিরা ঝোপে-ঝোপে গা-ঢাকা দিয়ে উঠল ওপরের পাহাড়ে। দু-পেয়ে মানুষ বেড়-শিকারে এসেছে বনে।

বাঘ তার ঘাসের ডেরায় গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে ছিল; হঠাৎ দূরে কিসের শব্দ? হরিণেরা পালায় কেন? আর উত্তরে পুবে পশ্চিমে

সব দিক থেকে শব্দটা যেন এগিয়ে আসছে তারই দিকে! ছুটল বাঘ হুঙ্কার করে। কিন্তু কোথায়? চারদিকেই যে সেই ভয়ানক শব্দ! আসছে—এগিয়ে আসছে—গোল হয়ে তাকে ঘিরে। খালি দক্ষিণে আওয়াজটা নেই। সেদিক পানে ছুটল বাঘ। ছুট—ছুট! সামনে ওগুলো শাদা শাদা কী উঠেছে? দু-পেয়ে মানুষের তাঁবু? এগিয়ে আসছে আওয়াজটা, আর থেকে-থেকে গর্জে উঠছে বন্দুক। প্রচণ্ড ক্রোধে হুঙ্কার ছেড়ে একটা তাঁবুর পানে ছুটে গেল সে। ওখান দিয়েই পালাতে হবে। হঠাৎ তার পায়ের তলার মাটি গেল সরে আর আকাশটা যেন ভেঙে পড়ল মাথায়।

তাঁবু থেকে অদূরে মাঝে-মাঝে বড়-বড় গর্ত খুঁড়ে তার ওপর ঘাসের চাপড়া চাপিয়ে পেতে রাখা একটা ফাঁদে পড়ল বাঘ। আর ধেয়ে এল দু-পেয়েরা—বাঘ, বাঘ! বাঘ পড়েছে ফাঁদে! অনেক চেষ্টা করল বাঘ ওঠার জন্যে। কিন্তু গর্তটা কুয়োর মত দু-পাশ খাড়া—শুধু লাফালাফি আর গর্জনই সার।

হাতিরা লক্ষ্য করছিল সব দূর থেকে কুতকুতে চোখ দিয়ে।

কুচকুচে কালো রাত ঘন আর গাঢ়। তার ভেতরে চোখদুটো জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মত। বৃথা চেষ্টার বিফলতায় বাঘ বসে বসে হাঁফাচ্ছিল। ওপরে ফুটে আছে অসংখ্য তারা, আর কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ একদিকের তারাগুলোকে আড়াল করে একটা প্রকাণ্ড পাহাড় যেন এসে দাঁড়াল! বাঘ নিচু হয়ে একটা গোঁ-গোঁ শব্দ করে উঠল। হাতিটা নিথর আকাশে শুঁড় তুলে ঘ্রাণ নিচ্ছে। তারপরে নিঃশব্দে সরে গেল হাতিটা।

একটু পরে একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল পড়ল গর্তটার ভেতর। বাঘ হুঙ্কার করে উঠল। মানুষের তাঁবুতে মানুষেরা বলাবলি করল, 'আজ চেঁচিয়ে নিক। কাল ফাঁস-দড়ি ফেলে বাঁধলেই হবে।'

আর-একটা প্রকাণ্ড ডাল পড়ল গর্তের ভেতর। এবারে বাঘটা আর চেঁচাল না। সে তখন চাঙা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর

গর্তের ভেতরে পড়া ভাঙা ডালে পা দিয়ে সাবধানে খানিকটা উঠে এল সে। গর্তের মুখটা কত দূর? নখ দিয়ে গাছের ডালছুটো আঁকড়ে, পেশীগুলো সটান করে লাফ দিল সে, ছিটকে পড়ল এসে একেবারে গর্ত পার হয়ে, গোদা হাতিটার পায়ের কাছে।

মুহূর্তের মধ্যে বিস্ময়কর পরিণতি! কেঁদো বাঘ তার ধারালো নখের মালা বিস্তার করে হাতির দোদুল্যমান শুঁড়ে বসিয়ে দিল প্রচণ্ড এক থাবা। উপস্থিত-বুদ্ধিতে হাতিও কম যায় না—আহত রক্ত-ঝরা শুঁড়টা দিয়েই সে জড়িয়ে নিল বাঘটাকে, তারপর শূন্যে একটা পাক দিয়ে নামিয়ে আনল তার পায়ের তলায়। প্রচণ্ড চাপে পিষে গেল কেঁদো বাঘের ধড় আর মুণ্ডু।

বোধহয় সেটা বিজয়-উল্লাস! বারবার বৃংহণ-ধ্বনিতে কেঁপে উঠছে বন-প্রান্তর, বনের চারিদিকে ছুটে চলেছে দৈত্যের মত খেড়ে হাতিটা—আহত শুঁড়টা আকাশের দিকে উঁচু করে।

পুব আকাশে তখন সবে আলোর ফিকে রেখাটুকু দেখা দিতে শুরু করেছে…

ঝিরঝিরে বাতাসে বনমল্লিকার গন্ধ ভেসে আসছে—বনানীর কোন অজানা কুঞ্জবীথি থেকে।

বনান্তরাল

এদিকের উপত্যকাটার বনভূমির কোলে সৃষ্টির প্রথম দিনের ঔদাসীন্য নিয়ে সূর্য ঢলে পড়েছে। সূর্যকে ছাড়িয়ে দুধারে ধূম্রাভ পাহাড় এঁকে-বেঁকে শূন্যে, মহাশূন্যে মাথা তুলে দিয়েছে। সূর্য মরণোন্মুখ, তাই আকাশ লালে লাল ; আর সেই বিষণ্ণ লালিমার ছোপ-মাখা এদিকের বনের কৃষ্ণচূড়ার দলের পানে তাকালে যেন মনে হয়, বনের মাথায় ধিমিয়ে-ধিমিয়ে আগুন জ্বলে উঠেছে।

অন্তহীন পশ্চিম আকাশের কোল বেয়ে চলেছে সারে-সারে বাদুড়ের দল সাঁই—সাঁই ! গাছের মাথায় মাথায় দিন-শেষের পাখির দলের বন্দনা হল শুরু। এই আদিম বনের অনাদি কোলে আঁধার নেমে আসছে ! বন-মহিষেরা জলার পাড়ে শ্রান্ত দিনের শেষ জাবর কাটছে। একটা বাকলওয়ালা গাছের ডালে কিলবিলে বিশাল দেহটা তার জড়িয়ে দিয়ে ময়াল নিথর। জলার আর-এক পাড়ে লম্বা-লম্বা ঘাসের ভেতর মৃদু-মৃদু সুইস্-সুইস্ শব্দ···বাঘ ? বাঘ ? বহুদূর পাহাড়ের মাথা থেকে ভেসে আসছে ভাঙা শাঁখের আওয়াজের মত হাতির দলের বৃংহণ।

'কি, ই, কিরকি-কি···'

বনের পাহারাদার চিলের সেদিনের মত শেষ ডাকটা কাঁপতে-কাঁপতে বাতাসে ছড়িয়ে গেল···

'ই-ই, কিরকি-ই !' 'যে পায়ে শব্দ ওঠে না, যে চোখ আঁধারে জ্বলে, যে কানে দূর বাতাস খবর বয়ে আনে, সে-ই শুধু বনে চলার অধিকারী।'

তারপরে বনভূমি নিথর।

রাত-চরা প্যাঁচার ডাকও থেমে গেছে। জোনাকিরা নিভে গেছে, আর সেইসঙ্গে নিভু-নিভু রাতের তারা। শুধু আকাশের মহাশূন্যের এক কোলে সৃষ্টির প্রথম দিনে কক্ষচ্যুত কোন্ এক জ্যোতিষ্কের মত ঝুলে আছে উজ্জ্বল শুকতারা। এক-ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া অকস্মাৎ জানিয়ে গেল ঊষার আগমনী, আর সেই সময়, বন যেখানে লতা-গুল্মে-গাছে মিশিয়ে-জড়িয়ে গভীরতম, সেখান থেকে একটা শব্দ ওঠে —মচ্ মচ্…খচ্ মচ্।

জলার পাড়ে বন-মহিষের দলের কান খাড়া হয়ে ওঠে। বনের রাজা বাঘ আকাশে নাক তুলে ঘ্রাণ নেয়। ময়ালের চোখদুটো মরকত মণির মত জ্বলে ওঠে।

—মচ্ মচ্…কচ্ কচ্ শব্দটা একঘেয়ে বেজেই চলে নির্বিকার, যেন ভীমসেনের আহার চলেছে,—আর রাতের পৃথিবী সূর্যের পানে মুখ ঘোরাতে থাকে।

পাহারাদার চিলের জাগরণী ডাক কেঁপে-কেঁপে আকাশে ছড়িয়ে যায়, 'কি ই কিরকি ই!—জাগো…জাগো! যে পায়ে শব্দ ওঠে না, যে চোখ আঁধারে জ্বলে, যে কানে দূত বাতাস খবর বয়ে আনে, সে-ই শুধু বনে ছোটার অধিকারী।'

তারপর, অকস্মাৎ বন কাঁপিয়ে কি-যেন একটা জীব ছুটে চলে যায়। ধাক্কায় তার দুটো ছোট-খাট গাছ ভেঙে পড়ে।

চিল চমকে চায়। কী ওটা? পায়ে তার ভূমিকম্পের গর্জন, চোখদুটো তার প্রায় বোজা। চোখেও কি ছাখে না? না হলে ময়ালের গাছের নিচে দিয়ে কোন জানোয়ার কখনও হেঁটে যেতে পারে? আর বাতাস তার কানে কি কোন খবর নিয়ে আসে না? না হলে, বাঘ যে বেরিয়েছে তার প্রাতরাশের সন্ধানে, এ-খবরটাও তার কানে পৌঁছয়নি? বনের সব নিয়ম ভেঙে জানোয়ারটা ছুটে চলে অথচ…দাপিয়ে বন…কাঁপিয়ে পৃথিবী!

বন-মহিষেরা আকারে বিরাট বটে, কিন্তু মেজাজটা তাদের মোটা-

মুটি ঠাণ্ডা। তাদের এলাকায় তাদের জলটুকুতে কেউ পা না বাড়ালেই তারা ঠাণ্ডা থাকে। আর তাদের ভয়ই-বা কাকে? বনের রাজা বাঘটাকেই তারা যা একটু সমীহ করে। কিন্তু একবার তাদের একটা বাচ্চা চুরি যাওয়ায়, রাগে পেয়ে বাঘটাকে সেবার তারা এমন শিক্ষা দিয়েছিল যে, বাঘও আর ঘেঁষে না তাদের এলাকায়। অবশ্য, মহিষ-সর্দারের কপালে আজও লেগে আছে বাঘের থাবার গভীর জয়টীকা, কিন্তু বাঘও সেবারে অক্ষত যায় নি। সেই থেকে কাঁধের ওপর পাঁশুটে-লোম-ঝামরে-পড়া মহিষদের আর ঘাঁটায় না বাঘ।

সেদিন সকালে জলার জলে স্পাইডার-লিলিরা সবে চোখ বুজিয়েছে। তখনও বাতাসে ভেসে আছে তার সুবাস, আর শির্‌শিরিয়ে জল কাঁপিয়ে রাঙামুড়ি হাঁসের দলের ময়ূরপঙ্খী-সার ভেসেছে। মহিষেরা জলে নামতে যাবে, এমন সময় মহিষদের এলাকায় যেখানে লতায় গুল্মে গাছে মিশিয়ে জড়িয়ে গভীরতম, সেখান থেকে একটা শব্দ ভেসে এল—কচ্ মচ্…খচ্ মচ্।

মহিষেরা উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

—কচ্ মচ্…খচ্ মচ্!

মহিষ-দলপতি ক্রুদ্ধ একটা গর্জন ছাড়ল।

—কচ্ মচ্…খচ্ মচ্! শব্দটার যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। মহিষেরা দাঁড়াল গোল হয়ে, তারপরে পায়ের ক্ষুরে-ক্ষুরে ঝড় তুলে ক্রুদ্ধ গরম নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে আক্রমণ করল তারা।

মহিষ-দলের সে আক্রমণের সামনে হাতিও রণে ভঙ্গ দিত, কিন্তু অকস্মাৎ এ কী হল? সেই তীরের মত ছুটে-আসা মহিষের দলকে ছত্রখান করে দিয়ে, পৃথিবী দাপিয়ে ঠিক যেন একটা পাহাড়ের বাচ্চা ছুটে চলে গেল। মহিষ দলপতি এক ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গিয়েছিল, নিমেষে উঠে দাঁড়াল; আর পর-মুহূর্তে দেখল, ঝড়ের বেগে একটা ছোটখাট পাহাড় ছুটে আসছে, যেন চোখেও ভাল দেখেনা—আর দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা। মহিষ-দলপতি সপাং করে ল্যাজটা তুলে

ফেলল আকাশে, আর পর-মুহূর্তে হাওয়া। মহিষেরা আর দাঁড়ায়? চেঁচাতে-চেঁচাতে ল্যাজ তুলে পলায়মান দলপতির অনুসরণ করল তারা!

বাঘ পড়ল মুস্কিলে। এ আবার কী কাণ্ড! মহিষেরা পালায় কেন? তাদের সেই ক্ষ্যাপা দৌড়ের আওয়াজে এদিকে বাঘের প্রাতরাশ গেল



ফস্কে। চাপা রাগে বাঘ গোঁ-গোঁ করে উঠল। কিন্তু ব্যাপারখানা কী? দু-পেয়ে মানুষ এল কি বনে? কই, বাতাসে তো নেই বাজনলা বন্দুকের বারুদের পোড়া-পোড়া গন্ধ? ব্যাপারটা কী, দেখতে হল বাঘের। এদিকে পেটের খিদেটাও চন্‌চনিয়ে উঠেছে।

দু-পেয়ে মানুষ ছাড়া আর যে জানোয়ারই হোক, বনের রাজা বাঘের হাতে আজ তার নিস্তার নেই। লম্বা-লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে সাবলীল পেশীগুলো কিল্‌বিলিয়ে, কান খাড়া রেখে, ঘাসের ফাঁকে-ফাঁকে চোখ জ্বেলে এগিয়ে চলে বাঘ। মখমল-মোড়া পায়ে তার এতটুকু শব্দ ওঠে না।

—কচ্ মচ্…খচ্ মচ্!

ঐ তো যেখানে লতায় গুল্মে-গাছে মিশিয়ে জড়িয়ে গভীরতম, ঐখান থেকেই আওয়াজটা আসছে—মচ্ মচ্…কচ্ মচ্…খচ্ মচ্…

কি যেন একটা জানোয়ার মহা আরামে খেয়ে চলেছে। বাঘ গোঁফটা চুম্‌রে নেয়। গাছ-পাতা-খাওয়া জানোয়ার, আঃ, তোফা!

আর নির্বিকার আওয়াজটা হয়েই চলে—কচ্ মচ্…খচ্ মচ্… মচ্ মচ্…

আকাশে হঠাৎ পাহারাদার চিলটার ডাক শোনা যায়,—'হুসিয়ার! যে পায়ে শব্দ ওঠে না, যে চোখ আঁধারে জ্বলে, যে কানে দূর বাতাস খবর বয়ে আনে, সেই রাজা-বাঘ চলে বনে। হুঁসিয়ার…হুঁসিয়ার!'

রাগে বাঘ হুঙ্কার দিয়ে গর্জন করে ওঠে। জলার জলে রাঙামুড়িদের ময়ূরপঙ্খী সার ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পত্-পত্ করে গাছের মাথা থেকে শাদা বকের ঝাঁক আকাশে পাখা মেলে দেয়। আওয়াজটা কিন্তু থামে না—মচ্ মচ্…খচ্ মচ্…বেজেই চলে। যেন ভীমসেনের নির্বিকার আহার চলেছে।

নিমেষে বাঘটা গাছের আড়াল দিয়ে বিদ্যুতের মত বাঁক নিয়ে ওত পেতে বসে।

অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয়ে যায় তার। তখন তার ঠোঁট গেছে গুটিয়ে, তীক্ষ্ণ বড়-বড় দাঁতগুলো পড়েছে বেরিয়ে, কানদুটো পেছন দিকে চ্যাপ্টা হয়ে মাথার সঙ্গে লেপ্টে গেছে, আর ল্যাজটা চাবুকের মত এপাশ-ওপাশ করে দুলছে। অকস্মাৎ শান্ত বন কাঁপিয়ে একটা দুরন্ত হুঙ্কার। বাঘ লাফিয়ে পড়েছে একেবারে জানোয়ারটার ঘাড়ে

এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রচণ্ড থাবাটাও চালিয়েছে বাঘ—যে থাবার ঘায়ে মহিষও ঘাড় ভেঙে লুটিয়ে পড়ে।

একটা অদ্ভুত কাণ্ড! শুধু-মাত্র ঘোঁৎ করে একটা শব্দ। তারপরে বাঘের মনে হল, সে যেন একটা সচল পাহাড়ের পিঠে লাফিয়ে পড়েছে। নখগুলো তার খসে উপড়ে যাওয়ার জোগাড়—দাঁত বসবে কোথায়? ভেঙে গেল বুঝি! আর পাহাড়টা দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে। হঠাৎ বেরালের মুখ থেকে ইঁদুরের মত এক ঝটকায় মাটিতে ছিটকে পড়ে বাঘ, এবং পরমুহূর্তেই একটা খড়্গো গেঁথে আকাশে উঠে গিয়ে আবার সবেগে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয় সে। বাঁ-দিকের পাঁজরের একটা দিক তার ছ্যাঁদা হয়ে গেছে, ভল্‌ভলিয়ে রক্ত ছুটে আসছে,—আর গোঙাতে-গোঙাতে বাঘ দ্যাখে, সেই সচল পাহাড়টা আবার ছুটে আসছে তার পানে। প্রাণপণে পেশীগুলোকে কিল্‌বিলিয়ে, গড়িয়ে, জানোয়ারটার পথ থেকে সরে যায় বাঘ, তারপর নিমেষে ল্যাজ তুলে ন্যাংচাতে-ন্যাংচাতে ঘাসের ভেতর মিলিয়ে যায়। ময়ালের বনে যে লোল বাকলওয়ালা গাছটার ডালে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে শিকারের আশায় ওত পেতে বসে থাকে ময়াল সাপ, ঠিক সেই গাছটা ধাক্কায় ধাক্কায় কেঁপে-কেঁপে উঠতে থাকে। একটা ছোটখাট পাহাড়ের বাচ্চা যেন গাছটার গায়ে গা ঘষছে। ময়ালের শরীরে একটু জীবনের স্পন্দনও দেখা যায় না···নিথর। পাহাড়টা আবার হেলতে-দুলতে চলে যায়।

গাছটার মাথায় আকাশে পাখা-ভাসা চিলের গলা শোনা যায়—'যে পায়ে শব্দ ওঠে না, যে চোখ···'

ময়াল হিস্‌-হিস্‌ করে বলে ওঠে, 'যে জীবের শরীর তার বুদ্ধির চেয়ে অনেক—অনেক বড়, যার আধ-বোজা চোখকে ময়ালেরা ঝিমিয়ে মোহময় করে দিতে পারে না, যার চামড়ায় বাজনলা বন্দুকের গুলি লেগে ফিরে যায়, ময়াল এড়িয়ে চলে তাদের।'

চিল হেঁকে ওঠে, 'কিরকি ই ই! ময়ালের ভাল হোক; ওটা কে,

ময়াল? মহিষদের যে তাড়িয়ে বেড়ায় আর বাঘের পাঁজর ফুটো করে দেয়?'

হিস্‌হিসিয়ে ময়াল বলে, 'গণ্ডার! গণ্ডার! ব্রহ্মনদীর পাশের পাহাড় থেকে এই ছট্‌কে এল কাল। বাদুড়েরা দেখেছে।'

* * *

আর অস্ত-সূর্য আবার যখন আকাশ রাঙিয়ে তোলে, গাছের মাথায় মাথায় শাদা বকের ঝাঁক এসে বসে—কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ফুলে, আগুন-জ্বলা বনের মাঝে মাঝে, গাছের মাথায় মাথায় শাদা বকের ঝাঁককে যখন মনে হয় স্তবকে স্তবকে শাদা ফুলে ফুটে আছে, —সেই সময় গণ্ডারটা নামে জলার জলে, আর বিরাট দেহটা তার জলে ডুবে যায়, শুধু জলের ওপর জেগে থাকে কদাকার খড়্গটা। বনভূমি নিস্পন্দ। সেই সময় ঝিমঝিমে জলাটার পানে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে, সৃষ্টির প্রথম দিনের অতিকায় কোন একটা জানোয়ার জলার থেকে প্রথম জন্ম নিচ্ছে আদিম পৃথিবীর বুকে।

মন্ত্রী

কাজ থেকে সেদিন একটা ফিটন-গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলাম, দেখি, একটা কুকুর-ছানা বেশ তুলকি চালে ফিটনটার পাশে-পাশে চলেছে। কানত্বটো তার ঝোলা-ঝোলা, গায়ের রং সোনালি। দেখলেই বোঝা যায় দো-আঁসলা কুকুর। এখন জন্তুজানোয়ারের প্রতি আমার চিরদিনই একটা আকর্ষণ আছে, তাই বেশ একটু ঔৎসুক্য নিয়েই কুকুর-ছানাটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম ; তা ছাড়া ফিটনটার পাশে-পাশে কুকুরটার ঠিক পাল্লা দিয়ে যাওয়া দেখে একটু মজা লাগছিল। ঠিক যেমন তুরন্ত ছেলেরা ট্রাম-গাড়ি বা রেল-গাড়ির সঙ্গে ছুটে পাল্লা দেবার চেষ্টা করে, এও যেন তাই !

হঠাৎ সামনে ক্রুদ্ধ একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে চমকে সামনে তাকিয়ে দেখি, কিছু দূরে একটা বাড়ির গেটে মস্ত একটা গুণ্ডা কুকুর ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে আমার গাড়ির পাশের কুকুর-ছানাটার দিকে তাকিয়ে গজরাচ্ছে। ভয় হল, ওর কাছে পৌঁছুবামাত্র গুণ্ডা কুকুরটা এক আছাড়ে এই কুকুর-ছানাটাকে সাবাড় করে দেবে। দেখলাম কুকুর-ছানাটাও মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে গুণ্ডা কুকুরটাকে দেখে নিল, তারপর হঠাৎ দৌড়ে এসে ফিটনের আসনে আমার মুখের দিকে তাকালো—কী যেন বলতে চায়। এদিকে আমরা ততক্ষণে সেই গুণ্ডা কুকুরটার দিকে এগিয়ে চলেছি হঠাৎ কুকুর-ছানাটা আর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক লাফ মেরে ফিটনের ভেতর আমার পায়ের কাছে উঠে এল, আর আমার গাড়িখানা যেই সে গুণ্ডা কুকুরটাকে পার হয়ে গেল, অমনি সে এমন তাচ্ছিল্যভরে গুণ্ডাটার দিকে তাকাল যে আমি না হেসে থাকতে পারিনি।

গুণ্ডা কুকুরটাকে পার হয়ে খানিক চলে আসার পর কুকুর-ছানাটা যেমন নিঃশব্দে উঠে এসেছিল, তেমনি আবার নেমে গিয়ে গাড়ির পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে চলতে লাগল। আমার বাড়ি অবধি এসেছিল। তারপর গাড়ি যখন থামল, একবার থেমে দাঁড়িয়ে আমার পানে তাকাল সে। তার দুষ্টুমি-ভরা চোখে ছিল—অনেক ধন্যবাদ মশাই! তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল সে।

চালাক জানোয়ার! আমি ডাকলাম, 'আয় আয়, চু-চ্চু!'

সে থমকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপরে লেজ নাড়তে-নাড়তে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল। যেন ঈষৎ দ্বিধা, নতুন আলাপের লজ্জাও খানিকটা।

'আয়, আয়! যাবি?'

ঘাড় বেঁকিয়ে সে বলল, 'ভুঃ! ভুঃ!' তারপর লেজ নাড়তে-নাড়তে আমার পেছু পেছু বাড়ির মধ্যে এল। ওর নাম রাখলাম, মন্ত্রী।

স্বাস্থ্যবান দুরন্ত ছেলের প্রাণের প্রাচুর্য যেমন ঠিক পথে চালানো দরকার, প্রথম-প্রথম মন্ত্রীকে নিয়ে সেই সমস্যায় পড়েছিলাম। ওর ছিল অফুরন্ত প্রাণের প্রাচুর্য আর মনটা ছিল অবাধ স্বাধীন। পরবর্তী জীবনে সে যখন পোষ মেনে আমাদের বাড়িরই একজন হয়ে উঠেছিল, তখনও দেখেছি, কোনদিনই সে আমাকে প্রভু বলে মেনে নেয়নি, নিয়েছিল বন্ধু বলে।

মন্ত্রীকে বাড়িতে ছেড়েই রাখা হত কিন্তু যখন আমি প্রথম-প্রথম ওকে নিয়ে বেড়াতে বার হতাম, ওর গলায় একটা শেকল দিয়ে নিতাম। গলায় শেকল পরে বেরোতে মন্ত্রীর ছিল ভারি আপত্তি। প্রথম দিকে দু-চার দিন এইরকম শেকল গলায় বেরোবার পর একদিন বিকেলে শেকলটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বাড়িতে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও শেকল পেলাম না। অগত্যা একটা দড়ি জোগাড় করে মন্ত্রীর গলায় বেঁধে তাকে নিয়ে বেড়াতে গেলাম। বেশ বুঝতে পেরেছিলাম

যে শেকলের অধীনতা যতটুকুই থাক, গলায় দড়ির অপমানে মন্ত্রী কাহিল হয়ে উঠেছে। সেদিন সে বেড়াতে বেরিয়ে একবারও লাফায় নি, ঝাঁপায় নি, মাথা হেঁট করে আমার পেছু পেছু চলেছে।

এইভাবে দুদিন কাটাবার পর তৃতীয় দিনে যখন তার গলায় দড়ি বাঁধতে যাচ্ছি, মন্ত্রী হঠাৎ বাগানে চলে গেল। একটু পরে দেখি, বাগানের ছাই-গাদা থেকে শেকলটা মুখে করে এনে যেন অত্যন্ত ঘৃণার ভরে আমার পায়ের কাছে ফেলে দিল। স্বাধীনতা খর্ব হওয়া যেন অনেক ভাল—গলায় দড়ির অপমান কিন্তু অসহ্য!

তার প্রথম যৌবনে মন্ত্রীকে নিয়ে বেশ একটু বিপদেই পড়েছিলাম। এমনকি এক সময় ঠিক করেছিলাম ওকে আর বাড়িতে রাখা যাবে না, তাড়িয়ে দিতে হবে। বাড়িতে কার্পেট বালিশ—যা তার নাগালে ছিল—সব সে ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে দিত। আমার স্ত্রী তো তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ওকে অনেক শেখাবার চেষ্টা করেছি, অনেক দেখিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। তখন কি বুঝেছিলাম যে অগাধ প্রাণের প্রাচুর্যই ওকে শান্ত রাখতে পারে না এবং সেটা যৌবনের খেয়াল,—বয়সের গাম্ভীর্য এবং অভিজ্ঞতা এলেই কমে যাবে? এমন দিন এল যে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হল, মন্ত্রীকে বিদায় দিতে হবে। এমন লোকসান আর কতদিন সওয়া যায়?

আমাদের বাড়িটা ছিল রাস্তার একদম শেষে, রাস্তাটা সেখানে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ রাস্তা, তাই সেটা ছিল ছেলেমেয়েদের খেলার আড্ডা। শহরের ছেলেমেয়েরা খেলার খোলা মাঠ পায় না, তাই যেখানে যেটুকু পায়, মানিয়ে নেয়।

সেদিন বিকেলে আকাশে মেঘ কালো করে এসেছে। সেইদিনই মন্ত্রীকে বিদায় করে দেওয়ার দিন। আমি ওর গলা থেকে বকলসটাও খুলে নিয়েছি, ট্যাক্সি করে নিয়ে গিয়ে দূরে, অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে আসব। পথ থেকে ওকে তুলে এনেছিলাম ঘরে, আবার পথেই

বিসর্জন দিয়ে আসব। আকাশে মেঘ ঘন, ঘনতর হয়ে উঠছে। এমনি দিনই ভাল। আমার বাড়ির সামনে ছেলের দলের কোলাহল থেমে গেছে—যে যার বাড়ি চলে গেছে। এমন সময় বারান্দা থেকে আমার স্ত্রী হাঁ-হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমার দু-বছরের ছেলেটা তখনও রাস্তায় খেলছে, আর দেখা গেল একটা ষাঁড় ঝড়ের মত তার দিকে আসছে ছুটে। খোকা বিমূঢ়ের মত, স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। ষাঁড় আর তার মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প।

হঠাৎ নিমেষে ভোজবাজির মত কাণ্ড ঘটে গেল। আমার হাত থেকে হাউইয়ের মত ছিটকে মন্ত্রী গেল বেরিয়ে। তারপরে দেখি, খোকার আর ষাঁড়টার মাঝখানে—ষাঁড়টার পায়ের কাছে মন্ত্রী গড়াগড়ি খাচ্ছে। ষাঁড়টার গতি কিন্তু থেমে গেছে। এক লাফে খোকাকে কোলে তুলে আনলাম। পলায়মান ষাঁড়টার পেছনে মন্ত্রী তখন বীরদর্পে চেঁচাচ্ছে। মন্ত্রী তো রয়ে গেলই, এবং আমাদের কার্পেট আর বালিশও যথেষ্ট ছেঁড়া হতে লাগল।

দিন যায়। সব জীবের ওপরই জীবন গাম্ভীর্যের ছাপ রেখে যায়!

আমার ছিল শিকারের শখ। বনে-বনে আগে অনেক ঘুরেছি, এখনও ঘুরি। মন্ত্রী ছিল তখন আমার অচ্ছেদ্য সঙ্গী আর পরামর্শ-দাতা। সেই অবাধ স্বাধীন বন্য জীবন ছিল মন্ত্রীর বড় প্রিয়। বনের ধারে রাতে ক্যাম্প ফেলে যখন ঘুমোতে যেতাম, আমার পায়ের কাছে শুয়ে থাকত মন্ত্রী। রাত-চরা জানোয়ারের ভয় কম ছিল না, কিন্তু পাহারাদার মন্ত্রী থাকত সঙ্গে। রাত্রে সাবধান করার ক-টা সঙ্কেতি ডাক বার করেছিল মন্ত্রী। বাঘের ডাকের সময় মন্ত্রীর একরকম ডাক, ভাল্লুকের সাড়া পেলে একরকম নিচু গর্জন, আরও কতরকম ডাক ডাকত মন্ত্রী কত রকমের জানোয়ারের গন্ধে! তার সেইসব ডাকের অর্থও ক্রমে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে এসেছিল।

একদিন রাত্রে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মনে হল, পায়ে কি যেন আঁচড়াচ্ছে! বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কিন্তু বনে উপস্থিত-বুদ্ধি হারালে চলে না।

ধীরে-ধীরে চোখ মেলে নিঃশব্দে আস্তে-আস্তে উঠে বসলাম। বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেছি। দেখি, মন্ত্রী তখনও আমার পায়ে আঁচড়াচ্ছে, কিন্তু একটিও শব্দ করছে না। অন্ধকারে ঈষৎ চাঁদের আলোয় চোখটা অভ্যস্ত হয়ে এলে দেখলাম, আমার নিচু ক্যাম্প খাটটার তিন হাত দূরে একটা কালো সাপ। টর্চ-লাগানো বন্দুক গর্জে উঠল। মাথা ছিটকে, থেঁতলে, কেউটে নিস্পন্দ হয়ে গেল। মন্ত্রীকে টেনে নিয়ে তার মাথা চাপড়াতে লাগলাম। বাঘ-ভাল্লুকের বেলায় ডেকে সে সঙ্কেত করে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে যদি সে ডাকত তাহলে আর আমার রক্ষা ছিল না। সাপটার ছোবল পড়ত আমার পায়ে। নতুন অবস্থায় না ডেকে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ থেকেই সে আমাকে সঙ্কেত করেছিল।

মন্ত্রীর সব কাহিনী লিখতে গেলে একটা গোটা উপন্যাস হয়ে যেতে পারে, তাই শেষটুকু লিখেই শেষ করি।

মন্ত্রী চলে গেছে! সে তখন বুড়ো হয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই সে তখন তার ঘরের সামনে একফালি রোদের ভেতর দুই থাবার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমোত। সেদিন, রাত তখনও যথেষ্ট গভীর হয়নি, আমরা শুয়ে পড়লেও ঘুমোইনি তখনও। হঠাৎ শুনি, লাফিয়ে লাফিয়ে মন্ত্রী ওপরে উঠে আসছে। সে এল, এসে প্রথমে আমার স্ত্রীর পায়ে মাথাটা ঘষল, তারপর এল আমার বিছানায়, আমার পায়েও মাথাটা ঘষে গেল সে। তারপর আমাদের ছেলের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ছেলে তখন বড় হয়েছে, আলাদা ঘরে শোয়। ঔৎসুক্য হল। উঠে গেলাম খোকার ঘরে। দেখি, খোকা ঘুমোচ্ছে—আর ঠিক যেমন আমাদের পায়ে মাথা ঘষে গিয়েছিল মন্ত্রী, তেমনি খোকার পায়েও মাথা ঘষে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে নেমে গেল।

মনটা কেমন করে উঠল। ভোরবেলা উঠে আগে নিচে নেমে দেখি, প্রতিদিন সে যেমন দুই থাবার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘাড় কাত করে ঘুমোয়, তেমনি ঘুমোচ্ছে—কিন্তু সে ঘুম চির-নিদ্রা!

আগের রাত্রে সে এসেছিল আমাদের কাছে বিদায় নিতে।

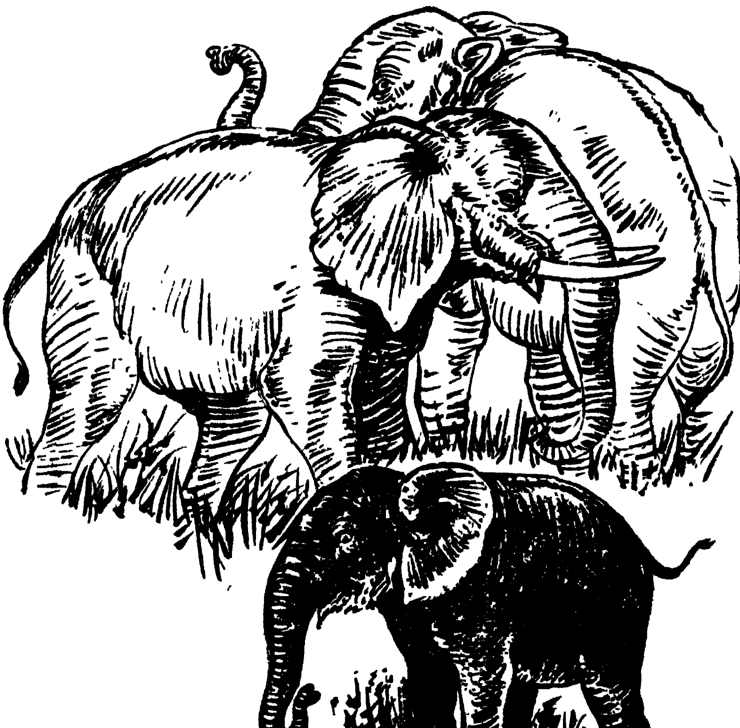
কালো হাতি

সেখান থেকে পৃথিবী দেখা যায় না। কৃষ্ণ-কুন্তল সজল মেঘের দল ভেদ করে, ভেদ করে আকাশ-বিস্তৃত কুয়াশার চাদর মহাশূন্যে উঠে গেছে গিরিরাজের সগর্ব চূড়া। মাথায় তার শুভ্র-সোনালি মুকুট প্রতিদিন প্রভাতে ঝিকমিক করে উঠে, আর গম্ভীর কালো সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ তার কটিদেশে সোনালি অজগরের মত মেখলা হয়ে থাকে। পৃথিবী দেখা যায় না সেখান থেকে। শুধু মহাদেবের চোখের তীক্ষ্ণ প্রাণদায়ী সূর্যালোক এ রাজ্য ভেদ করে পৃথিবীর গায়ে গিয়ে পড়ে আর মহাদেবীর সহস্র-কোটি সকরুণ স্নেহময় স্নিগ্ধ নয়ন রাতের পৃথিবীর ওপর ঝিকমিক করে।

এ রাজ্যে থাকে শাদা হাতির দল। যেমন বিশাল তাদের শরীর, তেমন শুভ্র গায়ের রং,—যেন তারা সেইমাত্র দুধ-সায়র থেকে স্নান করে উঠে এসেছে। গম্ভীর তাদের বৃংহিত পাহাড় থেকে পাহাড়ে মেঘ থেকে মেঘে মেঘে বিশাল ডমরুর মত বেজে-বেজে যায়। এই শাদা হাতির দলের প্রকৃতি গম্ভীর। দিনের শেষে, অস্তসূর্যকে পিঠে রেখে, আকাশের পটে স্থির স্থাণুর মত এরা যখন শান্ত উদাত্ত কণ্ঠে সামগান গায়, তখন যেন মনে হয় পৌরাণিক মুনিরা ধ্যানে বসেছেন।

এদের মধ্যে যখন একটা বাচ্চা কালো হাতি জন্মাল, এ রাজ্যের সকলের বিস্ময়ের সীমা রইল না তখন। তাও জন্মাল জন্মাল, কিন্তু বাচ্চা কালো হাতিটার প্রকৃতিও যেন কেমন অদ্ভুত। নেই তার কোন গাম্ভীর্য, কোন কিছুর প্রতি সম্মান, মহাদেবীর এ রাজ্যের সুন্দর সৃষ্টির প্রতি কোন শ্রদ্ধা—খালি খেলা আর খেলা।

বাচ্চা কালো হাতিটা শুঁড় নেড়ে নেড়ে রামধনু রঙের প্রজাপতিদের তাড়া করে বেড়ায়। সাতরঙা প্রজাপতিরা যখন সার বেঁধে ধনুক হয়ে আকাশে রামধনু গড়ে আর সেই সৌন্দর্যের মহিমায় ধ্যানমগ্ন হয়ে যায় এ রাজ্যের প্রাণীরা, তখন হঠাৎ কোথা থেকে ক্ষুদে



কালো ঝড়ের মত রামধনুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই বাচ্চা কালো হাতিটা, শুঁড়ের ঘায়ে ঘায়ে খান-খান করে দেয় রামধনুর সাতরঙা ঝিকিমিকি, তারপরে খিল-খিল করে হাসতে-হাসতে শুঁড় তুলে ছুটে পালিয়ে যায়।

প্রজাপতিরা গিয়ে মহাদেবীর কাছে নালিশ জানায়। মহাদেবী স্নিগ্ধ রহস্যময় হাসি হাসেন।

সেবারে এক কাণ্ড হয়ে গেল। সূর্য তখন পাটে বসেছে, শাদা হাতির দল আকাশের পটে ছবির মত নিথর, ধ্যান-গম্ভীর। হঠাৎ বাচ্চা হাতিটা কোথা থেকে এসে শুঁড় দিয়ে হাতির দলের দলপতির গায়ে ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল।

সক্রোধে একটা গম্ভীর হুঙ্কার ছাড়ল দলপতি। তারপরে নিজেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। মহাদেবীর রাজ্যে ক্রোধ! এ রাজ্যে ক্রোধ নেই, দ্বেষ নেই, হিংসা নেই। এ রাজ্যে আছে ভালবাসা, সৌন্দর্য আর নম্রতা।

শাদা হাতিদের দলপতি গেল ছুটে মহাদেবীর কাছে, 'মা! এ কী হল! মহাদেবীর রাজ্যে ক্রোধ!'

মহাদেবী সব শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'কালো হাতি তার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।'

কেটে গেল ছেলেবেলা। কালো হাতিটা উঠল বড় হয়ে, আর সেই হল তার দুঃখের শুরু। ছেলেবেলায় বনে ছিল ফুল আর প্রজাপতি। আর বর্ষায় যখন বরফ-নদী গলে উপলে উপলে ঝুম্-ঝুম্ করে নূপুর-পরা ঝর্না নামত আর পাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে শিলার গেণ্ডুয়া খেলত সে, তখন তার সঙ্গীর প্রয়োজন হয়নি। এবার কিন্তু সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ। শাদা হাতির দলে সে মিশতে পারে না। শাদা হাতিরা কালো হাতিটাকে আমল দেয় না। সে যেন দল-ছাড়া, গোষ্ঠি-ছাড়া, বানে-ভেসে-আসা এক প্রাণী। আর, দলে সে স্থান পাবেই বা কী করে?

সেবার হাতির দলে লাগল মল্লযুদ্ধ। মহাদেবীর রাজ্যে ক্রোধ নেই দ্বেষ নেই, কাজেই শক্তির প্রবৃত্তিকে মুক্তি দেবার জন্যে হাতিরা মাঝে-মাঝে মল্লযুদ্ধ লড়ে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দুটো শাদা পাহাড় যেন তেড়ে গিয়ে ধাক্কা খায়, আর শুঁড়ে শুঁড়ে

গজদন্তে-গজদন্তে সমস্ত বনভূমি কাঁপতে থাকে। কখনও বা এ হারে, কখনও বা ও হারে।

সেবারের মল্লযুদ্ধে কালো হাতিটা গিয়েছিল তেড়ে। কিন্তু হল কী, না, প্রথম ধাক্কাতেই সে বন থেকে গড়াতে-গড়াতে একেবারে নিচে গিয়ে পড়ল। শাদা হাতিদের তুলনায় সে নিতান্ত দুর্বল। বলীয়ানদের দলে দুর্বলের স্থান কোথায়?

পৃথিবীর হাতি এরকম অবস্থায় দলচ্যুত হয়ে দুষ্ট হয়ে ওঠে। দলছাড়া সেই দুষ্ট হাতি আচমকা কোন একলা প্রাণী পেলে তাকে আক্রমণ করে মেবে ফেলে রাগ নিবৃত্তি করে। কিন্তু কালো হাতিটার এখানে সে উপায়ও নেই। মহাদেবীর রাজ্যে যে-কোন প্রাণীই তার চেয়ে বলবান। কাজেই দলছাড়া কালো হাতিটা মনের দুঃখে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। ছেলেবেলার খেলা এখন আর খেলা যায় না। শুধু যদি সে মহাদেবীর রাজ্যে কোন কাজে লাগতে পারত, তাহলেও মনে সুখ পেত। হাতিরা যখন মহাদেবীর জন্য ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে যায়, তখন সে যোগ দিতে পারে না। ফুলের বনে শাদা হাতিরা তাকে আর ঢুকতেই দেয় না। প্রজাপতিরা তাকে দেখে রঙের ফুলঝুরির মত ছিটকে পালায়।

মাঝে-মাঝে আকাশে শুঁড় তুলে আর্তনাদ করে ওঠে কালো হাতিটা; দু-চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে। আর মাঝে-মাঝে কোন এক জাতিস্মরের মত আবছা এক ছায়া তার মনে চমকে যায়—বেগবতী নদীর তীরে রক্ত-রাঙা পলাশ বন, কদলী ক্ষেত, মহুয়ার মধু আর একদল হাতির দলপতি হয়ে স্বাধীন অবাধ বিচরণ। কী সেই দেশ? কোথায়, কোথায়?

পৃথিবীতে আকাশের দিগ্বলয়ে লজ্জায় লাল সূর্য ঢলে পড়েছে; বর্ষার শেষ। যেদিকে দু-চোখ যায়, দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ আর মাঠ—বিবর্ণ হলুদ বরন। আকাশে দুটো ফিঙে পাখি বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে ভেসে চলেছে।

ফিঙে-গিন্নি প্রশ্ন করে, 'আর কত দূর ?'

ফিঙে জবাব দেয়, 'যেদিকে দু-চোখ যায়, শুধু মরা মাঠ। একটি দানা শস্যও নেই! এদিকে অজন্মা, আর ওদিক জলে ভেসে ডুবে গেছে। চল চল, আরও এগিয়ে চল।'

'আর কোথায় যাবে ? ঐ তো দূরে দেখা যায় সমুদ্দুর!'

ফিঙে বলে, 'আমরা চলে যাব সমুদ্দুরের ওপর দিয়ে এ দেশ ছেড়ে, যেখানে আছে সোনার বরন ফসল মাঠ জুড়ে। এ দেশ মরে গেছে, জ্বলে গেছে।'

ফিঙে-গিন্নি জিগেস করে, 'সমুদ্দুর পার হব কী করে গো? যদি মরি ?'

ফিঙে বলে, 'এ দেশে থাকলে তো না খেয়ে মরব! বরং যদি পার হই সমুদ্দুর, হয়ত মিলবে গমের দানা-ভরা ক্ষেত, মকাইএর মাঠ, সোনালি সবুজ ধান। এ দুর্ভিক্ষময় দেশে আর নয়। চল চল।'

ফিঙেরা বাতাসে ভেসে তির্যক পাখা চালায়।

* * * *

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। হুমকি-দেওয়া কালো মেঘের সৈন্যদল ছত্রছান। টুকরো-টুকরো শাদা তুলোট মেঘ সোনালি নীল আকাশে হেসে ভেসে চলেছে। মহাদেবীর রাজ্যে পড়ে গেছে মহা সোরগোল। দেবী মর্তে যাবেন।

দেবীর সিংহটা ধরে বসেছে, 'মা, এবার আমি তোমায় পিঠে করে বাংলায় নিয়ে যাব!'

দেবী হেসে বলেন, 'তা হয় না, বাছা! এবার বাংলায় দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষের করাল কালো ছায়া। মাঠে-মাঠে ধান নেই। এবার আমি যাব গজে। আমি গজে গেলে আবার পৃথিবী উঠবে শস্য-শ্যামল হয়ে। বাংলার বিবর্ণ হলুদ মাঠ হেসে উঠবে সবুজে। দেখছিস না, ওরা আমায় ডাকছে গজের পিঠে ?'

তাই শাদা হাতিদের দলে পড়ে গেছে মহা হৈ-চৈ। কে নিয়ে যাবে মহাদেবীকে পিঠে করে? কার হবে এত বড় সম্মান?

তাই দলে-দলে শাদা হাতির দল এল ছুটে মহাদেবীর কাছে। কত সে হাতি—বিশালকায়, তুষারশুভ্র! এদের দলে কি আছে সেই কালো হাতিটা? কী করে থাকবে? শাদা হাতির দলে তার স্থান কোথায়? মহাদেবীর রাজ্যে কোন কাজে সে লাগতে পারে না।

হাতিরা কলরব করে, 'মা, আমি তোমায় নিয়ে যাব! আমি নিয়ে যাব।'

দেবী হেসে বললেন, 'বেশ তো! কিন্তু একটা কথা আছে। বাংলা দেশে এখনও প্রচণ্ড গরম। আমাকে যে নিয়ে যাবে, তার তুষার-শাদা রং কালো হয়ে যাবে।'

হাতিদের মুখ শুকিয়ে যায়। তারা তাকাতে থাকে এ-ওর মুখে। কে যাবে? কে যাবে এবার? কালো রং নিয়ে দলছাড়া হয়ে থাকতে পারবে কে?

মহাদেবী হেসে ফেলেন, 'এত ভাবছ কেন? আমাকে নিয়ে যাবে সেই কালো হাতি। ওর রং তো আর কালো হতে পারবে না!'

শাদা হাতির দল স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। ডাক, ডাক—কালো হাতিকে ডাক!

কালো হাতিটা বিরস মুখে মহাদেবীর কাছে এসে দাঁড়ায়। শাদা হাতির দলকে মহাদেবীর সিংহাসনের পাশে দেখে ভয়ে তার বুকটা একবার ধ্বক করে ওঠে। কে জানে কী আছে তার কপালে!

মহাদেবী মৃদু হেসে যখন তাকে প্রশ্ন করেন, 'আমাকে মর্তে নিয়ে যাবে তুমি?'—কালো হাতিটা যেন তার কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে লাগবে মহাদেবীর কাজে! তাও শ্রেষ্ঠ সম্মান—স্বয়ং মহাদেবীকে বহন করে নিয়ে যাওয়া! গর্বে তার বুকটা ফুলে ওঠে আর দেহে তার আসে যেন শত হাতির বল! আনন্দে আকাশে শুঁড়

তুলে বৃংহিত করে ওঠে সে। সে বৃংহিত বর্ষাশেষ শরতের মেঘে-মেঘে ডমরুর মত বেজে বেজে পৃথিবীকে জানিয়ে দেয় আগমনী।

*   *   *   *

বাঙলায় সে ক-দিন কী ধুমধাম! মহাদেবের চোখে এসেছে স্নিগ্ধতা, তাই সোনালি স্নিগ্ধ রোদে হেসে উঠেছে এদিকের পৃথিবী। আকাশে বাতাসে আনন্দ, অথচ তার মধ্যে ঝঙ্কৃত বীণার তারে তারে করুণ মীড়ের মত ভেসে আসে ঈষৎ বিষণ্ণতা। দেবীর যাবার সময় হয়ে এল। বিবর্ণ হলুদ মাঠে লেগেছে সবুজের ছোঁয়া। নব অঙ্কুর দেখা দিল মাঠে মাঠে।

দেবীকে মর্তে নামিয়ে দিয়ে কালো হাতিটা এ-কদিন ঘুরে বেড়িয়েছে পৃথিবীতে। কেমন যেন সব স্বপ্নে-দেখা,—চেনা-চেনা রাজ্য। গাছের মাথায় আগুন-ধরানো লাল পলাশ বন, কদলী-ক্ষেতের অভাব নেই, আর পাহাড়ের কোলে-কোলে, বেগবতী নদীর তীরে তীরে চকিতে দেখেছে সে হাতির দল—সব কালো, তারই মত!

কিন্তু সে মহাদেবীর গজবাহন। দশমীর দিন মহাদেবীর কাছে এসে প্রশ্ন করে, 'মা, যাবে কখন?'

মহাদেবী হেসে বলেন, 'আমি দোলায় যাব, বাছা!'

'কেন মা?'

'দোলায় গেলে তবে পৃথিবী শস্য-শ্যামলা হয়ে ভরে থাকবে!'

'তবে আমার কী হবে?'

মা দেখিয়ে দেন, 'ঐ দূরে দেখছিস গিরিরাজের পাদদেশে প্রশস্ত বনভূমি! ঐখানে আছে তোর দল। ওদের দলপতি হবি তুই। আর খেলার অভাব নেই। নদীর তীরে তীরে কদম্বরেণু মেখে হাতির দল খেলা করে বেড়ায় যেখানে, সেখানে পড়েছে তোর হাতছানি।'

মহাদেবী চতুর্দোলায় পা দেন, আর কালো হাতি সগম্ভীরে মহাদেবীর জয়ধ্বনি করে ছুটে চলে যায়। যেখানে পাহাড়ের

সানুদেশে প্রশস্ত বনভূমি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, যেখান থেকে মেঘ-ডমরুর মত ভেসে আসে পৃথিবীর কালো হাতিদের বৃংহিত।

*   *   *   *

ফিঙেরা ফিরে আসে।

ফিঙে গিন্নি বলে, 'আহা, চোখ জুড়িয়ে যায়! কী ছাই সমুদ্দুরের পারের দেশ! আমাদের বাংলার মত দেশ কি আর আছে? মাঠের পর মাঠ ধানে ভরা। কুলকুল করে বয়ে চলে নদী। দূরের বন থেকে ভেসে আসে হাতির দলের ডাক, হরিণ বিদ্যুতের মত চমকে ছুটে চলে। কাশবনে দোলে শাদা চামর, পলাশের বন লালে লাল। কত ধান কত—দানা!

ফিঙে গম্ভীরভাবে বলে, 'দেবীর এবার গজে আগমন আর দোলায় গমন ছিল কিনা!'

সাধু

সাধু ছিল একেবারে দেশি কুকুর।

শহরে হলে, এক আঁশলা, দো আঁশলা, কান-ঝোলা-ঝোলা, ল্যাজ-মলা-মলা কুকুর-সাহেবদের সঙ্গে মিলিয়ে তোমরা তাকে বলতে, স্রেফ নেড়ি কুত্তা। এমনকি কুকুরও নয়, কুত্তা না বললে মনের দূর-ছাই ভাবটা ভাল করে ফুটে বেরোত না। কিন্তু সাধু তো কখনও শহর দেখেনি, তাই গাঁয়ের-লোকের ঘরে ডালরুটি খেয়ে, কাঁটা ভাত খেয়ে, বড় পাহাড়-তলায় খরগোস শিকার করে, সাধু, দেশি কুকুরটা, বেশ নাদুস-নুদুস চুকচুকে। শহরের ডাস্টবিন-খেকো হাড়জিরজিরে খেঁকি নয়।

গাঁয়ের লোকেরাই ওর নাম দিয়েছিল সাধু। শুধু যে ভগবানের দেওয়া গেরুয়া রঙের পোশাকটা দেখেই তার নাম সাধু হয়েছিল তা নয়। ডাল, রুটি, ভাতের পোষ মেনেও সে পোষা হয়নি। গাঁয়ের লোকের মধ্যে সে ছিল একটা লোক,—সমান সমান, স্বাধীনচেতা।

সারাদিন সে ঘুরে বেড়াত,—মহুয়া তলায়, শাল আর কুচি বনে, মাঠে-মাঠে, পাহাড়ে। কত আকাশ, কত হাওয়া, কত পাখি, কত ফুল,—কত স্বপ্ন হলদে-নীল চোখে! কে গড়েছে এইসব—এই আকাশ, বাতাস, ঘাট, মাঠ, এই পৃথিবী? তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না? আনন্দ-মাখা ক্লান্তি নিয়ে সে তিনটে ঘেঁসাঘেসি শাল গাছের ছায়ায় এসে বসত। সেইটাই ছিল তার আড্ডা বা ডেরা বা কেল্লা।

ক্ষিদের সময় সে গ্রামে গিয়ে ঢুকত। একটা বাড়িতে গিয়ে সে সাড়া দিত, 'ভোঃ ভোঃ!'

অর্থাৎ ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু জবাবের অপেক্ষায় মিনিট পাঁচকের

বেশি অপেক্ষা করত না। খেতে দিলে দিলে, না দিলেও ক্ষতি নেই, কারণ তোমার দিল্ চাইছে না।

সবার ছোট্ট বুধিয়া যখন একা একা খেলতে খেলতে পুকুরে পড়ে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিল, সাধু ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাপড়টা কামড়ে ধরে তাকে ডাঙায় টেনে তুলেছিল। তারপর বুধিয়াকে আগলে পাড়ে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত ডাক ডেকে উঠেছিল। ছুটে এল বুধিয়ার মা, বুধিয়ার বাবা, বুধিয়ার ঠাকুমা, চাচা, চাচি, ফুফু আরও কত কে। বুধিয়ার মা যখন সাধুকে বুকে চেপে ধরেছিল, একটা কথাও বলেনি সাধু, বরং বুধিয়ার মার গালটা চেটে দিয়েছিল। কিন্তু বুধিয়ার বাবা যখন রুটি আর মকাই-সেদ্ধ নিয়ে এল, ঘাড় ফিরিয়ে গম্ভীর চালে চলে গেল সাধু। দূর, এখন কি খাবার সময়? পড়শির বিপদে আপদে পড়শি সাহায্য করেই থাকে।

কোনদিন যদি কাঠ কাটতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে সাধুর তিনটে শাল গাছের ছায়ায় গিয়ে বস, সাধু তোমার পাশে বসে লেজ নাড়বে। একটি কথাও বলবে না সে। আর সামনে খুলে যাবে নরম নীল আকাশ,—কত আকাশ! সেই নীলে মেঘেরা ভাসিয়ে দিল শাদা শাদা ফাঁপানো ফানুস। দূরে আবছা সবুজ ছায়ামাখা পাহাড়ের দল ঝিম-ঝিম করবে। টুসকি-মারা শিমুল ফুলে ফুলে তোমার মন রাঙা হয়ে যাবে। দেখতে পাবে, শিমুল ফুলের মধুর লোভে-লোভে কত মেলা-মেশা। রাঙা-ঝুঁটি-তোলা শাদা শাদা দাড়িওলা বুলবুলিরা ডুবে গেছে শিমুল ফুলের ভেতর। কাঠবেড়ালিরা ছুটছে, আসছে—মধু চেটে যাচ্ছে, থমকে দাঁড়াচ্ছে অবাক চোখে। কত ফুল, কত মধু! তোমার মনের মধু মিষ্টি করে দেবে মন। কে গড়েছে এই মধু, এই পৃথিবী-ছোঁয়া বাঁধন-হারা অনন্ত নীল মহাশূন্য! তোমার মনে হবে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না?

একদিন কিন্তু রাস্তা এসে গেল।

মস্ত রাস্তা, আঁকা-বাঁকা ঢেউ-খেলানো অজগর সাপের মত। কত গাঁয়ের ভেতর দিয়ে, কত বন পাশে রেখে, কত পাহাড়ের তলায় তলায়। রাস্তা—অজগরের রাস্তায় যে পড়ে তাকেই রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। তাই সাধুর তিনটে শাল কাটা পড়ল। শালের গুঁড়িকে চেপ্টে দিয়ে, শিমুল গাছের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেল।

সাধুর কোন অসুবিধে হয় নি। সে ঠিক রাস্তার মাঝখানে, যেখানে শাল তিনটে দাঁড়িয়ে থাকত, সেইখানেই শুয়ে থাকত দিনের শেষে। চুকচুকে মসৃণ রাস্তা, বেশ ভালই হল।

একদিন সাধু দেখল, রাস্তা দিয়ে ভোঁ-ভোঁ করতে করতে ছুটে আসছে মস্ত একটা জানোয়ার। সাধুর কেল্লায় আগেও অনেকে এসেছে, জিরিয়ে গেছে। কিন্তু ভোঁ-ভোঁ জানোয়ারটাকে অমন করে ছুটে আসতে দেখে সাধুর কেমন সন্দেহ হল। উঠে দাঁড়াল সে। আর সেই ভোঁ-ভোঁ জানোয়ারটা হুস্ করে পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। রাগ হয়ে গেল সাধুর। ছুটল সে ভোঁ-ভোঁ জানোয়ারটার পেছনে ভোঁ-ভোঁ করে। কী তাড়া রে বাবা! তারই কেল্লার ওপর দিয়ে ছুটে চলে যাবে? দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে নাক শোঁকবার সময় নেই, কথা বলবার সময় নেই?

তারপর থেকে জ্বালাতন হয়ে উঠল সাধু সেই ভোঁ-ভোঁ জানোয়ার-গুলোর জ্বালায়। রাত নেই, বিরেত নেই, বড়-বড় চোখ জ্বালিয়ে খালি এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক! এ রাস্তাটাও তারই জন্যে তৈরি হয়েছে তার কেল্লার ওপর দিয়ে। আর নিজের ঘরে সে-ই পাবে না বিশ্রাম করতে? ছুটে মরুক চোখজ্বলা ভোঁ-ভোঁ জানোয়ারগুলো, তার কেল্লা সে ছাড়বে না!

রানা-মহারাজ পণ করেছেন, তিনি আর জলস্পর্শ করবেন না যতক্ষণ বুঁদির কেল্লা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। মন্ত্রীরা আর কী

করেন, মাটি দিয়ে নকল বুঁদির গড় তাঁরা একটা গড়ে তুললেন। রানা মহারাজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চললেন বুঁদির কেল্লাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। রানার এক ভৃত্য ছিল বুঁদিওয়ালা। বুঁদির কেল্লা মাটিতে মিশিয়ে যাবে, আর বুঁদিওয়ালা রাজপুত তাই দাঁড়িয়ে দেখতে পারে কখনও? মাটির নকল কেল্লায় চড়ে গর্জে ওঠে বুঁদিওয়ালা—

'খবরদার! বুঁদির লোকের গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে বুঁদির কেল্লা দাঁড়িয়ে থাকবে মাটিতে।'

নাগরা জুতো তালে তালে-গর্জন করে আসে, মচ্-মচ্-মচ্-মচ্। মাটির কেল্লা মাটির সঙ্গে মিশে যায়, আর তার সঙ্গে মিশে যায় বুঁদিওয়ালার শেষ রক্তের ফোঁটা।

সাধু কিন্তু গর্জনও করে না, খবরদারও বলে না।

একটা ভোঁ-ভোঁ জানোয়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে আসতে কি-ই-ই-কিচ, চিলের মত চিৎকার করে ব্রেক কষে এঁকে বেঁকে-ঘুরে যায়। গড় আগলে ঠিক মাঝখানে শুয়ে আছে সাধু। সে ভৌ ভৌ করে হেসে ওঠে।

আর এক রাত। দূর থেকে বড় বড় চোখ জ্বালিয়ে ঝক-ঝক ঘ্যাচ-ঘ্যাচ গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে একটা মস্ত বড় ভোঁ-ভোঁ জানোয়ার। সাধু গড় আগলে রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুয়ে আগে থেকেই হাসতে শুরু করেছে। এখনই জানোয়ারটা চিলের মত চিৎকার করে এঁকে বেঁকে ঘুরতে শুরু করবে। এগিয়ে আসছে তো আসছেই জ্বলজ্বলে চোখদুটো। সাধুও হাসছে। আসছে তো আসুক, তার কেল্লা সে ছাড়তে পারে না। আর হাসতে হাসতেই পিষে পেট ফেটে মরে যায় সাধু। কেল্লা কিন্তু ছাড়েনি।